দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ বার্ষিক পত্রিকা -

প্রমা

[২০২৩-২৪]

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ বার্ষিক পত্রিকা -

প্রমা

[২০২৩-২৪]

আহ্বায়ক: ড. দেবদীপ ধীবর

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ
দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

PRAMA (Annual Issue)
Durgapur Women's College Magazine - 2024
durgapurwomencollege@gmail.com

প্রকাশ : ২০২৪

© লেখক: পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় লেখাপত্রের বিষয়বস্তু ও তার মৌলিকতার ভার সংশ্লিষ্ট লেখকদের

প্রচ্ছদ

পায়েল বর

প্রকাশক

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ৭১৩২০৯

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ সহায়তায়

ধী পাবলিকেশন

জিঞ্জিরা বাজার, ব্রেস ব্রিজ, ১নং পোল,

মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০০৮৮

Mob: +918017956574

e-mail: dhi.publication@gmail.com

কথামুখ....

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজের যাত্রা শুরু ১৯৮১ সালের ৫ই এপ্রিল। দুর্গাপুরে এটিই একমাত্র মহিলা কলেজ। মহিলাদের শিক্ষাপ্রসার সামাজিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২১ এর সেন্সাস অনুযায়ী ভারতের গড় শিক্ষার হার ৭৭ শতাংশ আর মহিলাদের শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ অর্থাৎ জাতীয় গড়ের থেকে কম। মহিলাদের যথার্থ শিক্ষা প্রসারই একটি দেশ ও তার সমাজের অগ্রগতির অন্যতম কারণ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে মহিলাদের শিক্ষার প্রসার ও মহিলাদের সক্ষমতা অর্জনের সহায়ক হওয়ার লক্ষ্যে এই কলেজ এগিয়ে চলেছে।

এখানে পাঠ্যক্রমের শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশের জন্য তৈরী হয়েছে ‘নান্দনিক’ – একটি শিল্পচর্চা কেন্দ্র। মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার জন্য রয়েছে ‘মহিলা শিক্ষাচর্চা কেন্দ্র’। সমাজ ও শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। সমাজের অবহেলিত মানুষদের সঙ্গে এই কলেজকে যুক্ত করার লক্ষ্যে তৈরী হয়েছে ‘দিশা’-DWC যেখানে নিকটবর্তী এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদান করে আমাদের কলেজের ছাত্রীরা। এই শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রীরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করে মনুষ্যত্বের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক ও সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাক এই আশা রাখি।

ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল
অধ্যক্ষা
দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকের কলম

নিছক ঝোঁকের বশেই এই কলেজে আসা। আর আসার পরদিন থেকেই চলে যাওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু যেতে পারিনি, বলা ভালো যেতে চাই নি। অভাবে টান বাড়ে বোধ হয়। আপনারা এটাকে সমস্যা নামেও ডাকতে পারেন। কিন্তু সেই সমস্যাগুলোই কখন যে সম আশাতে পরিণত হয় বুঝতেও পারিনি। যাওয়ার প্রসঙ্গটা আমার কাছে নতুনের মতো ঠেকে। যখনি মনে হয় আর এসবে যাবো না, তখনি গল্প হয়ে যায়- রঙিন প্রসপেক্টাস, ফাঁকা আসন, ভর্তির টানটান উত্তেজনা, ন্যাক প্রস্তুতি, B++, পরীক্ষা-র পরীক্ষা, ভাইরাস, লকডাউন, অফলাইন-অনলাইন, নতুন ওয়েবসাইট, ডিজিটাল কলেজ, অথবা আরও একটি 'প্রমা'।

'প্রমা' একটি পত্রিকার নাম। দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজের বার্ষিক পত্রিকা এটি। এই কলেজের সঙ্গে জড়িত অনেকের সৃজন এখানে জায়গা পেয়েছে। এই রকম একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব আমার মতো সম্পাদকের যথেষ্ট ভয় তথা ভারের। তবুও সাহস পাই, বর্তমান ছাত্রীদের তথা সহকারীদের মনোবাসনায়। তাদের মন আছে বলেই পত্রিকার কালো কালো অক্ষরগুলি আজও কিলবিলিয়ে ওঠে। নড়েচড়ে বসে পেন-পেন্সিলের দাগ। অনেক কিছু শেখার আছে তাদের থেকে। সে বাঁচতে শেখা হোক কিংবা ভাবতে শেখা। এ এক আশ্চর্য টাইম মেশিন। তাই প্রমা'র বয়স বাড়ে কিন্তু লেখকদের বয়স বাড়ে না। সেই একই বৃত্তে বার বার ফিরে আসা।

এবারের 'প্রমা'-র সংখ্যায় এমন অনেকেই আছে যাদের এটি প্রথম প্রকাশিত লেখা বা ছবি। অথবা এটাই প্রথম সৃজন। এবারের সংখ্যার জন্য জমা দেওয়া বেশির ভাগ লেখা আঁকাই প্রকাশিত। বেশি বাছিনি, বরং বলা ভালো বাছতে চাইনি। কেননা এই কাজগুলোর মধ্যে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ? সেটা বিষয় নয়। আসল কথা শুরুর শুরু করা। এরপর তো অনন্ত যাত্রা। তাই এবারের সূচীপত্রে যাদের নাম দেখছেন তারা কেউ বিখ্যাত নয় ঠিকই, কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার দাবী রাখতেও পারে। তাছাড়া এই কলেজ আমদের কাউকেই চিরদিন রাখবে না। কিন্তু লেখাগুলো কাজগুলো কলেজের হয়ে থেকে যাবে। আর এই কাজগুলোই কলেজের প্রাণ। তাই এই কলেজ আরও বেশি প্রাণ পাক, চিরায়ু হোক এই কামনা করি।

এই সংখ্যার 'প্রমা' প্রকাশের শুরুতেই তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা রইল যাঁদের ভালোবাসায় পরিশ্রমে এই 'প্রমা' এতদিন ধরে বড়ো হয়ে উঠেছে। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই এবারের 'প্রমা'র লেখক-লেখিকা তথা চিত্রশিল্পীদের। যাঁদের ছবি বা লেখা না পেলে পত্রিকাই হত না। একই সঙ্গে অভিবাদন জানাই কলেজের অধ্যক্ষা মাননীয়া ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল মহাশয়া ও পত্রিকা কমিটির সকল সদস্য, এবং ধী পাবলিকেশনকে। সবার শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় 'প্রমা' আগামীতে আরও অনেক পথ পাড়ি দেবে এই আশা রাখি। ধন্যবাদ।

ড. দেবদীপ ধীবর

পত্রিকা কমিটির আহ্বায়ক ও সম্পাদক

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

সূচিপত্র

প্রতিদিনের কবিতা	অনুশ্রী কুণ্ডু	৭
বন্ধু	অমিত সরকার	৮
আমি কাটার পথে হাঁটি	অর্পিতা বাউরী	৯
বৃষ্টি	আব্দুল আজিজ উস্ সুবহান	১০
'ইচ্ছেডানা'	ঋদ্ধিমা নায়ক	১১
কন্যাহত্যা	চিত্রা ব্যানার্জ্জী	১৩
আবার উড়ে যাবে তারা	দেবদীপ ধীবর	১৪
ইঁদুর ও বাঁদরের বন্ধুত্ব	দেবলীনা রায়	১৫
সম্পন্না	পারমিতা মন্ডল	১৭
প্রিয় কুসুম গাছটি	প্রিয়াংকা ঘোষ	১৮
নেশা-সর্বনাশা	বিবেকানন্দ গরাই	২০
অজানা আনিনি	ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল	২৩
ক্লাস vii	মিতালী ঘোষ মৌলিক	২৬
প্রীতি ও শুভেচ্ছা	মৌসুমি পাল	৩০
বিগত শতাব্দীর কন্যাদের প্রতি	রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়	৩১
পাখি	রিয়া দে	৩৩
প্রিয় ছাত্রীরা	শতাব্দী মুখার্জী	৩৪
নেতাজী	শ্রেয়া লাহিড়ী	৩৫
গান্ধীজীর দুই ইংরেজ কন্যা	সুদীপ মণ্ডল	৩৬
পক্ষীসভা	সুপর্ণা চক্রবর্ত্তী	৪১

नारी की पहचान	करीना कुमारी विश्वकर्मा	**৪৩**
जीवन स्त्री का	निधि कुमारी	**৪৫**
समाज में कोई ऐसा धर्म चलाया जाए	पिनाकी सिंह	**৪৬**
बस नारी होना	ममता कुमारी	**৪৭**
मत छेड़ो मैं नारी हूं	रितु कुमारी साव	**৪৮**
गुरु का योगदान	रूपा वर्मा	**৪৯**
HUMANITY	Riya Rudra	**৫১**
জাপানি মন্দির	সুলেখা মুর্মু	**৫২**
ফ্লোরেন্স নাইটঙ্গেল	পৌলোমী দাস	**৫৩**
গৌতম বুদ্ধ	প্রিয়া বাগ্দী	**৫৪**
মন্ডলা শিল্প	রিয়া রুদ্র	**৫৫**
অপেক্ষারত	প্রতিমা চ্যাটার্জী	**৫৬**

প্রতিদিনের কবিতা

অনুশ্রী কুণ্ডু
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মানুষের চলার পথে, এই আলোকোত্তর জগতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা কবির মনের যে ভাবনাগুলির সৃষ্টি করে। তা হয়তো মানুষের প্রতিদিনের জীবনের পাতায় পাতায় পরিণত হওয়ার কবিতার মতো। কবির মনের যে আশ্চর্য ভাবনা, তা তো আমাদের মন-ভাবনার, কল্পনার লতানো সৃষ্টি। অথচ মানুষের প্রতিদিনের জীবন কবির মনে এক আশ্চর্য আলোক রূপে ধরা দেয়, তা থেকেই জন্ম হয় এক নতুন কবিতার। তেমনি এক না-কবিতা-

কী লিখবো? কেনো লিখবো? যতই ভাবি...
ততই যেন মনের মধ্যে,
কাব্যের বিন্যাস ঘটে যায়, এবং
বাক্যেরও বিচ্ছেদ ঘটে অনবরত।
ভেবে চিন্তে যতই লিখি, ততই -
বাক্যের মধ্যের শূন্যতা যেন থেকেই যায় !
ভাবনা-চিন্তার মধ্যে -
বাক্য ও কাব্যের সমীরণ যতবারই আসুক,
বা যতবার যত ভাবে বাক্য লিখিনা কেন,
ততই যেন মনে হয় লেখা আর পাতার মধ্যে,
লেখার বাক্য ও কাব্য শেষ আর হয় না।
অথচ কলম আর পাতার মতো-
বাক্য ও কাব্য নিজেরাই হয়ে ওঠে অনাবিল।

-0-

বন্ধু

অমিত সরকার
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

তোকে প্রথম দেখে ভেবেছিলাম,
যাই কিছু হোক,
তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না কখনো।
কিন্তু সময় তো অন্য কাহিনী লেখে
সেই কাহিনী শুধু সময় ই জানে।
হয়ে যায় বন্ধুত্ব,বেড়ে যায় টান,
তোকে দেখতে না পেলে মন করত আনচান।
সময় বয়ে যায়,
ব্যস্তময় জীবনে পাড়ি দিই, তবুও
দিনের শেষে আজও মন খারাপ হলে
মন আমার মনকে বলে,
দুটো মনের কথা,মনে না রেখে
তার কাছে মন খুলে দিতে।
দেখবি মন হালকা হবে,
সব দুঃখ ঘুচে যাবে।
সারাজীবন বন্ধু পাশে থাকিস,
তোরও মন খারাপে আমায় সঙ্গে রাখিস।

-0-

আমি কাটার পথে হাঁটি

অর্পিতা বাউরী
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

এমনি এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যে
দাঁড়িয়ে দেখি আমিই পথে একা,
ভেবে দেখি ভালো আর মন্দে
মন চাইলেও, পাই না তোমার দেখা।

আকাশ যখন মেঘের পালকে ঢাকা
শহর তখন শুনশান, প্রায় শান্ত,
তুমিতো জানোই আমার পকেট ফাঁকা
দিন শেষে আমি নিরুপায় ক্লান্ত।

তাই পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকি
কিছু আসে যায় তোমার তাতে ?
আমি কাঁটার পথে হাঁটি
পাই'না দেখা, বিচ্ছেদেরই অজুহাতে।

-0-

বৃষ্টি

আব্দুল আজিজ উস্ সুবহান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

এই তো ছিল আকাশটা নীল।
দেখতে দেখতে কালো।
ধীরে ধীরে দেখতে থাকে সকাল বেলার আলো।
ঠান্ডা হাওয়া বইছে বেশ
মেঘের গুরু গুরু।
এই দেখো না চড়বড়িয়ে
বৃষ্টি পড়ার শুরু।
ওমা; দ্যাখো বৃষ্টি উধাও
আকাশ কেমন হাসে
তাকিয়ে দেখি মেঘের ফাঁকে
কার যেন মুখ ভাসে।

-0-

'ইচ্ছেডানা'

ঋদ্ধিমা নায়ক

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

'স্বপ্নপূরণ করতে নাকি অনেক অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আমি তো মধ্যবিত্ত!'- এই ভেবেই তোর্সা তার সব কিছু স্বপ্ন বাক্সবন্দী করে রেখেছিল পুরনো আলমারির পিছনে। তোর্সা খুবই শান্ত প্রকৃতির মেয়ে তার স্বভাব, আচরণ, কথাবার্তা ছিল ভালো পাশাপাশি বিদ্যা, বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। যখন সে স্কুলে পড়ত তখন সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করত। কিন্তু সময়ের এক বিপুল পরিবর্তনের সাথে সাথে তোর্সার জীবনে নেমে আসে এক কালো অন্ধকার রাত্রি। এই রাত্রির কেবল একাই যাত্রী হয় তোর্সা।

মা, বাবা ও ভাইকে নিয়ে ছিল তার এক ছোট সংসার। তার বাবা খুব বিলাস বহুল জীবন তোর্সাকে ও তার ভাইকে দিতে পারেনি, তবুও তারা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল, একদিন এক অজানা সত্য জানাজানি হয়ে যায়- তোর্সার বাবার বিরুদ্ধে। তখন তোর্সা সবে কলেজে উঠেছে, আর তার ভাই তখনও স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করেনি। তোর্সা প্রথমে চায়নি এই সকল কথা তার মাকে বলতে। কিন্তু ভগবানের করুণ পরিহাসের কারণে তার ছোট ভাই তোর্সার মা তপতী দেবীকে জানিয়ে দেয়। সব অজানা কথা শুনে তপতী দেবী পাগলের মতো হয়ে যায়। সংসার থেকে মুক্তির জন্য সে অনেক ভয়াবহ পথ অবলম্বন করে। তোর্সা ঠিক সেই সময় কি করবে সে বুঝতে পারে না। কারণ, কি আশেপাশের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী তোর্সাকে সাহস জোগানোর বদলে তাকে ভয় দেখায়। তোর্সা ও তার ভাই দেবদূতের অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে নিয়ে। তোর্সা খুব ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখেছিল শিক্ষিকা হতে। আর ভেবেছিল তার ভাইকে বড়ো ডাক্তার বানাবে। বিনামূল্যে গরীবদের সেবা শুশ্রূষা করবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের জীবনে যে এতো বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে সে বিষয়ে কোনোদিনও সে কল্পনা করেনি। তোর্সা বুঝতে পারছিল না, তার বাবার বিরুদ্ধে সে লড়াই করবে নাকি সবকিছু ভুলে নূতন করে আবার শুরু করবে। আসলে মূল কথা হলো এই জগতে অন্যায়ের সাথে আপোষ করা মানুষের সংখ্যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানুষের থেকে বেশি। তাই সে তার ছোট বুদ্ধি দিয়ে তার বাবার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে তাদের সংসার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তপতী দেবী সজন হারানো যন্ত্রণার পাশাপাশি এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা রাতদিন চিন্তা ভাবনা করে নিজের জীবনে এক নতুন ঝড়ের কেন্দ্র বিন্দু বপন করেন। ধীরে ধীরে সময় পার হতে থাকে। তপতী দেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তোর্সা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে সে কি করবে? নিজে অন্ধকার ঘরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অপর দিকে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা করা দেবদূত বাবার সম্বন্ধে সকল কথাবার্তা জানার পর তার বাবার প্রতি সমস্ত সম্মান রাগে পরিণত হয়। একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া দেবদূত বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শে এসে ভালো থেকে খারাপ চরিত্রের ছেলেতে রূপান্তরিত হয়। এই সকল বিষয় তোর্সা জানার পর সে বুঝতে পারে না, তার বর্তমান কাজ কি? মাকে নিয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া না ভাইকে এই পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে নিয়ে

যাওয়া। আসলে তোর্সার দেওয়ালে পিঠ সম্পূর্ণ ভাবে ঠেকে গেছে। কিন্তু যেখানেই সব কিছু শেষ সেখান থেকেই আবার থেকেই আবার নতুনের আরম্ভ। কারণ কালোরাত্রির পরই শুভারম্ভ হয় নতুন এক আলোর সকালের।

তোর্সা নিজে মনে মনে ঠিক করে তাদের ভেঙে যাওয়া সংসারকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে। সে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ধ্রুবর সাথে আলোচনা করে একটি দোকান দেয়। দোকানের নাম দেয়- 'ইচ্ছেডানা'। তপতীদেবীর শারীরিক অবনতির মূল কারণ ছিল মানসিক অশান্তি। 'ইচ্ছে ডানা'য় তোর্সা তপতী দেবীকে দেখভালের দায়িত্ব দেন। তোর্সা আর ধ্রুব দুজন মিলে সারারাত রান্না করে, দিনের বেলায় সেগুলি তারা বিক্রি করত। কয়েক বছর অতিক্রম হতে 'ইচ্ছে ডানা' যেন সত্যিই ডানা মেলে আকাশের মধ্য স্থান লাভ করল। দেবদূতও নিজের চরিত্রের পরিবর্তন করল। আবার তোর্সা 'ইচ্ছেডানা'র উন্নতির পাশাপাশি সে গ্রাজুয়েশন শেষ করে মাস্টার্সও শেষ করেছিল। এবং স্কুল শিক্ষিকার পরীক্ষা দিয়ে সে আজ একটা ভালো স্কুলের শিক্ষিকা। তোর্সার বাবা তাদের অসমাপ্ত জীবনকে ত্যাগ যেভাবে করেছিল, সে সময় তোর্সা ভেবেছিল সব কিছু হয়তো শেষ। কিন্তু ধ্রুবর সঙ্গ লাভ সত্যিই তোর্সার অনেক কাজে এসেছিল।

বিপদের সময় মাথা গরম না করে, একই বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনে সেই দুঃসময়কে অতিক্রম করে কিভাবে সামনের সুদীর্ঘ পথকে অতিক্রম করা যাবে। তোর্সা আজ জীবনে যতদূর গেছে সবাই তার মনের জোর পাশাপাশি বিশ্বস্ত বন্ধু ধ্রুবকে কেন্দ্র করে। কারণ, ধ্রুব না থাকলে হয়তো 'ইচ্ছেডানা' মধ্যগগনে ডানা মেলে উড়তে পারত না। আর তোর্সার মধ্যবিত্ত হওয়ার জন্য স্বপ্নপূরণ করতে অগ্রসর হতে পারত না। কারণ আর্থিক দিক থেকে শুধু ধ্রুব কেন? অনেক আত্মীয়-স্বজনও পারত। কিন্তু মানসিক শান্তি কেবলই ধ্রুব দ্বারাই সার্থক। যার ফলে তোর্সা আজ একজন সার্থক শিক্ষিকা। সে পেরেছে বাবা ছাড়াই মা-ভাইকে পুনরায় জীবন দান করতে। পেরেছে নিজের জীবনকে স্তব্ধ না করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কন্যাহত্যা

চিত্রা ব্যানার্জ্জী

ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ

কন্যাদেরকে হত্যা করে,
গড়ছো নাকি পুরুষদেরই সমাজ?
ভুলে যেও না নারীই তোমাকে,
ধারণ করে, গর্ভে দশ দিন দশ মাস।
যেদিন তোমরা বুঝতে শিখবে,
দেরি অনেক হবে।
দেখব তখন নতুন পুরুষ,
কেমনে জনম লবে।
ছেলেবেলায় মায়ের স্পর্শ,
পেয়েছো তুমি বক্ষে।
এখনো অনেক সময় আছে,
শুধরে নাও নিজেকে।
নাহলে একদিন খোয়াবে তুমি
নিজের কোলের মেয়েকে...।

-0-

আবার উড়ে যাবে তারা

দেবদীপ ধীবর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

চলে যাবো ভেবে আসিনি। আসবে বলে প্রতীক্ষাতেও থাকিনি। শুনবে ভেবে বলিওনি কোনদিন। পড়বে জেনে লিখিওনি এতকাল। আজ সেই দিন! এতকাল পর নির্দিষ্ট সীমানার কাছাকাছি এসে প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখন যে কোনো সময়, যে কোনো দিক থেকেই হোক বৃষ্টি নামতে পারে। আমরা যারা ভিজব না বলে একদিন এই ছাদের নিচে এসেছিলাম; আজ সেই ছাদই আমাদের সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। এক এক করে ভেঙ্গে যাচ্ছে গোপন নিরাপত্তার খুঁটি। মাথা নেড়ে তাতে সম্মতি জানাচ্ছে পুরানো সিলিং ফ্যান, বোবা ব্ল্যাক বোর্ড, অসংখ্য ডালপালা। আর শোঁ শোঁ শব্দে শুনিয়ে যাচ্ছে পুরানো গল্প-খবর! আরও অনেক গল্প জমা এই রঙ চটা দেয়ালগুলোর গায়ে!

ক্যাম্পাসের সারা শরীর জুড়ে এক গোপন ভালোবাসার ক্ষমতা আছে। তাই সিমেন্টের মধ্যে পা ডুবিয়ে থাকা কাঠের বেঞ্চগুলো বসে আছে তো আছেই। ধুলো মোড়া চেয়ার টেবিলগুলোর গায়ে লেপ্টে আছে ভালোবাসার আশ্চর্য রহস্য। এই নোনাধরা, অন্ধকার ক্লাস ঘরগুলোতে কিছু না থাকলেও খুশির কারণ ছিল। ছিল ভাববার অবকাশ। এখন উড়বার অপেক্ষায়! এবার আমাদের ব্যাগ গোছানোর পালা। সংসারও হতে পারে। যাইহোক বৃষ্টি নামার আগে চলো আমরা যে যার রিলিফ ক্যাম্পে উঠি। আমাদের এই একলা ক্লাসঘরে আজ আমাদের আর কেউ আসবে না। তবুও এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দুচোখ জ্বালিয়ে হাঁটতে থাকবে সেই পুরানো পাষাণ। এই পুরানো ক্যাম্পাস। যাকে আমরা দেখেও দেখতে পাবোনা কোনোদিন।

আবার নূতনরা যেদিন আসবে, সেদিন তারাও গল্প শুনবে। তারাও স্বপ্ন দেখবে। তারাও পুরানো হবে। আবার তারাও উড়ে যাবে!

০৬.০৪.২০০৪

-0-

ইঁদুর ও বাঁদরের বন্ধুত্ব

দেবলীনা রায়

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

বহুকাল আগের কথা। এক জঙ্গলে এক ইঁদুর ও এক বাঁদর একসঙ্গে বসবাস করত। তারা একসঙ্গে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা ছিল না। কথাবার্তা না থাকলে কী হবে? বাঁদর ইঁদুরকে খুব বিরক্ত করত। এত বিরক্ত করত যে ওই জঙ্গলে বাস করা ইঁদুরের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একদিনের ঘটনা বলি-

ইঁদুর তার বাসায় অর্থাৎ তার গর্তে শুয়ে বিশ্রাম করছে,এমন সময় বাঁদর একটা বিড়াল ছানা এনে ইঁদুরের গর্তের সামনে নামিয়ে রাখল, ইঁদুর সেই বিড়াল ছানাকে দেখে তো খুব ভয় পেয়ে গেল। বিড়াল ছানা যত 'ম্যাও, ম্যাও' করে ইঁদুর ততই ভয় পাই। তারপর অনেক কষ্টে ইঁদুর সেই বিড়াল ছানার থেকে বেঁচেছিল। ইঁদুর বুঝতে পারল কে এই বদমাইশিটা করেছে। কিন্তু ইঁদুর কিছু বলল না, চুপ করে গেল। তারপর বেশ কিছুদিন কাটল, ইঁদুর ও বাঁদর বেশ কিছুদিন চুপ করে রইল।

তারপর একদিন বাঁদর ইঁদুরের পিছনে আবার লাগল। ইঁদুর তো লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াই, আর জামাকাপড়, তোষক, বালিশ, লেপ, কাঁথা সব কেটে দেয়। সেদিনও ইঁদুর একটি লোকের বাড়িতে তার কাজ করতে যাচ্ছে, বাড়িতে পৌঁছে কাজ শুরুও করে দিয়েছে, এমন সময় ওই শয়তান বাঁদর ইঁদুরের পেছনে লাগার জন্যে এবং ইঁদুরকে ওই বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য একটা ফন্দি আঁটলো। বাঁদর ওই বাড়ির মালিককে ইঁদুরের কথা বলে দিল। মালিক ইঁদুরের কথা জানতে পেরে ইঁদুর তাড়ানোর জন্যে 'ইঁদুর মারার বিষ' এনে বাড়ির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিল। সেদিন ইঁদুর কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিল আর কী, নাহলে সেদিনই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত আর কি? সেদিনও ইঁদুর বাঁদরকে কিছু বলল না, কিন্তু ওই যে কথায় আছে না 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। বাঁদরেও একদিন সেই দশা হল।

সেদিন এক শিকারি ওই জঙ্গলে শিকার করতে এলো, সে জঙ্গলের একটি জায়গায় ফাঁদ পাতলো শিকারের জন্য, তারপর সে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। আর বাঁদর বাঁদরামি করতে করতে কীভাবে যেন ওই ফাঁদে পড়ে গেল। ব্যাস আর পাই কে, সে জালে আটকা পড়ল। শিকারি তাকে দেখতে পেয়ে জাল সুদ্ধ তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল আর বাঁদর খুব চিৎকার করতে লাগল 'বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও'। কিন্তু কে বাঁচাবে তাকে? তার বাঁচার আর কী সুযোগ নেই। এতদিন বাঁদর অনেক বাঁদরামো করেছে। সমস্ত পশু-পাখিকে বিরক্ত করেছে। এমনকি ওই ক্ষুদ্র প্রাণী ইঁদুরকেও ছাড়েনি। এখন সেইজন্য তার দুঃসময় কেউ তার পাশে নেই। কিন্তু যাকে সে এত বিরক্ত করেছে, সেই ইঁদুরই তার পাশে এসে দাঁড়াল। কীভাবে? সে কথাই এবার বলবো -

ইঁদুর সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল খাবারের সন্ধানে, ঠিক সেই সময় সে বাঁদরকে দেখতে পাই। ইঁদুর ইচ্ছে করলে কিন্তু প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু সেটা সে করল না, সে বাঁদরকে বাঁচতে ছুটে গেল। ইঁদুর শিকারির চোখ এড়িয়ে বাঁদরকে জাল থেকে মুক্ত করল, এবং দুজনেই সেখান থেকে পালিয়ে গেল। জঙ্গলের কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে বাঁদর ইঁদুরের কাছে ক্ষমা চাইল এবং এর ফলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হল।

-0-

সম্পন্না

পারমিতা মন্ডল
ছাত্রী, রসায়ন বিভাগ

আমরা নারী,
আমরা সবই পারি।
শৈশব যায় ছেলেমিপনায়;
কৈশরে আসে সহনশক্তি, বোধ-বিবেচনা-
যৌবনে দেখি কালো ছায়া যেন দেয় হাতছানি
পারব লড়তে একসাথে মোরা বহুরূপী দুনিয়ায়
ধরিত্রীকে আগলে রাখা আমাদেরও কাছ
শিক্ষা চায়, শিক্ষা চায় - এটাই নারীর লাজ
আমরা নারী,
কাঁধে-কাঁধ দিয়ে লড়তে পারি।
নেইকো পিছিয়ে আমরা 'নারী'
জল-স্থল-বায়ু পথে দিয়েছি পাড়ি
শত শত দুঃখ চেপে বুকে
কাজ করি একরাশ হাসি মুখে
জন্মসূত্রে দিয়েছে দেবীর আখ্যান
মা-দিদি-বোন রূপে পেয়েছি সম্মান
আমরা নারী,
আমরা সবই পারি।

-0-

প্রিয় কুসুম গাছটি

প্রিয়াংকা ঘোষ
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

আজ থেকে তিন বছর আগের কথা, দিনটি ছিল বর্ষার। সারাদিন অবিরাম টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল, বাড়ি ছেড়ে হোস্টেল যেতে হবে বলে আমার মনও ছিল বর্ষার মতোই ভারাক্রান্ত। অবশেষে বৃষ্টি থামলে আমিও বাবা-মার সাথে রওনা দিলাম হোস্টেলের উদ্দেশ্যে। মনটা এতটাই বিষাদে পরিপূর্ণ যে রাস্তার গাড়ির শব্দ এত কোলাহল আমার মনকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিল না। হঠাৎ পা থেমে গেল হোস্টেলের দরজায় এসে সম্পূর্ণ নতুন একটি জায়গা নতুন কত মুখ কত মানুষ। সবারই মাঝে নিজেকে খুব তুচ্ছ বলে মনে হলো। হোস্টেলে পৌঁছে ভর্তির কাজ সেরে বাবা মা রওনা দিল বাড়ির উদ্দেশ্যে আর আমি উঠলাম আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমার রুম এক নাম্বার রুমে। সেই রুমে আমি আর সেদিন এসেছে আমার রুমমেট নীলিমা। অনেক ভয়ে মনকে শক্ত করে পরিচয় হলো নীলিমার সাথে, আস্তে আস্তে হোস্টেলের সবার সাথে মিশতে চাইলেও মিশতে পারলাম না কারণ আমি ছিলাম খুবই চুপচাপ। বারবার মনে হতো কবে বাড়ি যাবো? মন কিছুতেই টিকতে চাইতো না।

এত বড় হোস্টেলের মধ্যে শুধু একটি কুসুম গাছ ছিল আমার প্রিয় বন্ধু যার কাছে পেতাম আমি শান্তি। যখন আমার খুব একা লাগতো সে কুসুম গাছের কাছে গিয়ে আমার দিন কাটতো আমার মনে হতো সে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমার কথা সে আমাকে তার বন্ধু ভেবে বলছে তার কথা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সূর্যের উত্তপ্ত রোদে তার পাতা যখন রুক্ষ হয়ে যেত তখন আমার মনে হতো তাকে যেন তার মা প্রচণ্ডভাবে বকেছে আবার সেই পাতায় যখন হালকা করে নড়ে ওঠে শো শো আওয়াজ করতো তখন মনে হতো তার মা যেন সব রাগ অভিমান ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছে বলে সে আনন্দে খিলখিল করে হাসছে। বর্ষার অঝোরে বৃষ্টির পর যখন তার পাতায় টুপ টুপ করে জল ঝরে পড়তো তখন মনে হতো সে যেন তার কান্না শেষ করে চোখের জল ঝেড়ে ফেলছে আবার সেই গাছেই যখন নতুন নতুন সবুজ কচি কচি পাতা বড় হয়ে উঠতো তখন যেন আমার মনে হতো সে জীবনে নতুন ভাবে বাঁচতে শিখছে। শীতের শেষে যখন তার সব পাতা ঝরে পড়তো তখন যেন তাকে দেখে মনে হতো সে তার সর্বস্ব হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার বসন্তের সেই গাছেই ছোট্ট ছোট্ট কচি লাল লাল পাতা দেখে মনে হতো সেও যেন আমাদের সাথে বসন্তের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছে।

এভাবেই কুসুমের সাথে কেটে যেত আমার হোস্টেলের দিন। দিন যেতে যেতে আমিও বদলালাম সে চুপচাপ মেয়েটি আজ অঝোরে কথা বলতে লাগলো সেই অচেনা অজানা কত মুখ আজ অনেক চেনা হয়ে গেল। আজ তারা আমার খুব কাছের বন্ধু। দেখতে দেখতে তিনটি বছর কেটে গেল। আজ সবার যে যার বাড়ি ফিরে যাওয়ার দিন, সকলের মন আজ বিষাদ। আর সেই কুসুম গাছটাও আজ যেন শান্ত নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে শেষ বার্তা দেওয়ার

জন্য সবাইকে ছেড়ে আজ চলে যেতে হবে, যেতে হবে সেই আমার প্রিয় বন্ধু কুসুমকে ছেড়েও। তিনটি বছর কেটে গেল, আজও বর্ষা। তফাৎ শুধু এটাই সেদিন বাড়ি ছেড়ে আসার জন্য মন ভারাক্রান্ত আর আজ বাড়ি ফিরে যাওয়ার। আমরা কেও কেও গিয়ে পৌঁছলাম নিজের বাড়ি আবার কেও দিল পড়াশোনার জন্য অন্য শহরে পাড়ি, কিন্তু সেই কুসুম গাছটির কোথাও যাওয়া হলো না। সে এখনো সেই একইভাবে হোস্টেলে নতুন যাত্রীর বন্ধু হওয়ার অপেক্ষাই ক্লান্ত হয়েও অক্লান্ত পথিকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

-0-

নেশা-সর্বনাশা

বিবেকানন্দ গরাই

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ভারতের সংবাদ মাধ্যম ভারত বর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যতই ঘোষণা করুক না কেন, আমাদের দেশে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। বর্তমানে দেশে ৭৫ শতাংশ মানুষকে‘অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান’নিয়ে চিন্তা করতে হয়, ফলে আমাদের দেশের যারা মেরুদন্ড অর্থাৎ যুবসমাজ তারা পর্যাপ্ত পরিমাণেশিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে না পেরে আজ দিশেহারা। এই দিশেহারা থেকে একটু স্বস্তি পেতে নেশাকে জীবনের একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের তরুণ সমাজ অর্থাৎ যুবসমাজ যা বর্তমান সমাজের জীবন্ত সমস্যা ।২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা স্বাস্থ্যে অনেকটাই পিছিয়ে গেছে। তাছাড়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। কলকারখানা নেই, কাজ নেই, শিক্ষার কোন মান নেই, চাকরি নেই, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি উপর রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার বুলডোজার চালিয়ে দিয়েছে।

নেশা আমাদের মধ্যে এক ধরনের মাদকতা সৃষ্টি করে। এবং এই নেশাবিভিন্ন ধরনের। প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে নেশা বলতে বিড়ি, সিগারেট ,খৈনি, বিভিন্ন প্রকার গুটকা,মদ, ড্রাগ ইত্যাদি বিষয় গুলি মাথায় আসে। তবে এ কথা বলা যায়, যেকোনো নেশা মানুষকে কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। আর মানুষ নেশার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে শুধু নিজের ক্ষতি করে না। ক্ষতি করে পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের, সমাজের, দেশের। এই বিষয়ে একটু আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

আমরা প্রথমেই আলোচনা করব ধূমপান নিয়ে। ধূমপান জাতীয় কোন জিনিস বলতে আমরা বুঝি বিড়ি,সিগারেট, গঞ্জিকা সেবন ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে সিগারেট পানে নিকোটিন সহ ৫৬ টি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য জানিয়েছে, বিশ্বের ১৯২ টি দেশে সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে পরোক্ষ ধূমপানে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ছলক্ষ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে শিশু হল এক লক্ষ ৬৫ হাজার। এদের মধ্যে নিউমোনিয়া ও অ্যাজমায় আক্রান্ত হয় বেশি। এছাড়া হৃদরোগ, ফুসফুসে ক্যান্সার, শ্বাস প্রশ্বাস জনিত রোগ দেখা দেয়। পরোক্ষ ধূমপানে নারী বেশি প্রভাবিত হয়। এ কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ৮১ হাজার নারীর মৃত্যু হয়ে থাকে। পরোক্ষ ধূমপানের সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইউরোপ এশিয়ার মানুষ। তাছাড়া সিগারেট সেবনে হাঁপানি,কাশি, যৌনক্রিয়ার অনীহা বা অক্ষমতা দেখা যায়।

আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হলো মদ্যপান। সারাদেশে তো বটেই, বর্তমানে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্রই মদের দোকান চোখে পড়ে। অবশ্য সরকারের মদতেই এই পানশালা গুলি গড়ে উঠেছে। অথচ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে শিক্ষা থেকে সরিয়ে, জীবন জীবিকা থেকে সরিয়ে, বিভিন্ন প্রকার ভাতার মাধ্যমে আম জনতাকে সরকার নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে। বর্তমানে

গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মফস্বল প্রায় সব জায়গায় মদ খেয়ে মাতলামি করা একটা শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ, শেষ হয়ে যাচ্ছে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ। যেকোনো অনুষ্ঠানে তাতে সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় হোক না কেন সেখানে নেশার একটা জায়গা আছে। এই সব অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকার নেশার কম্পিটিশন চলতে থাকে। বিড়ি সিগারেট ছাড়াও মদ এবং ড্রাগ পুজোর সময় বেশি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য প্রতিটি নেশার বিভিন্নতা রয়েছে। অত্যন্ত মদ্যপানে শরীরে গোপন রোগ বাসা বাঁধে। স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, লিভার কিডনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও মদের নেশায় আজ বিশ্ব পাগল।

এই নেশা প্রসঙ্গে যার কথা না বললে লেখাটা সম্পূর্ণ হয় না তাহলে ড্রাগ। নেশাগ্রস্ত মানুষের জীবনের মূল রসদ হলো ড্রাগ। এই ড্রাগ মানুষের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। এই নেশা বেশি পরিমাণে করে ছাত্র যুব-সমাজ। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেমেয়েরা এর কবলে পড়ে যায়। মানব দেহে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাকে অপমৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানের ড্রাগ বলতে হেরোইন অর্থাৎ সুগার ,হোয়াইট সুগার ইত্যাদি বোঝায়। তবে এর ব্যবহারিক পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। ইনহেল বা নাকের শুকেনেওয়া পদ্ধতি, ধূমপান, ইনজেকশন বা তরল পানি এর মত সেবন পদ্ধতি। ড্রাগ শরীরে সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির উপর এর প্রভাব সব থেকে বেশি।

এবার যে নেশাটির কথা বলব সেটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ- লিঙ্গ নির্বিশেষে ৮ থেকে ৮০ ও সবাইকে করেছে কমবেশি ক্ষতি সেটি হল স্মার্টফোন। বাংলা ভাষায় একে চলভাষ বা কথা সংযোগ বলা হয়। আধুনিক কালে এর সৃষ্টি কিন্তু ব্যক্তি সমাজে সর্বস্তরে। তবে এর ভালো দিক অবশ্যই আছে কিন্তু মানুষ এত নেতিবাচক দিকটা গ্রহণ করেছে যার ফলে আজ মহা সংকটে পড়েছে । সবাই আজ এত ব্যস্ত যে এর ব্যবহার বাসে ট্রেনে রাস্তায় অফিসে খেতে খামারে সর্বত্রই। ফলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে, আত্মীয়-স্বজন পিতা মাতা ছেলেমেয়ে কেউ কাউকে সময় দিতে পারছে না। সবাই যেন বলতে চাইছে অটোগ্রাফ সিনেমায় গানের মত “আমাকে আমার মত থাকতে দাও / নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি / যেটা ছিলনা ছিলনা সেটা না পাওয়াই থাক / সব পেলে নষ্ট জীবন।” কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষ ছিল সঙ্গবদ্ধ। পারস্পরিক মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যেত। একসঙ্গে বই পড়া খাবার খাওয়া খেলার মাঠে খেলা করা অবসর সময়ে গল্প করা টিভি দেখা এ যেন শঙ্খ ঘোষের ভাষায় বলতে হয় –“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” কিন্তু বুদ্ধিহীন মানব জীবন কালের স্রোতে সব কিছু যেন ভুলে যেতে চায়। আগামী ভবিষ্যৎকে সুস্থ রাখতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এই জাগরণ সমাজের সর্বস্তরে আনতে হবে।

নেশার কথা বলতে গেলে আরো অনেক কথা এসে যায়। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব নিজস্ব চাওয়া পাওয়া আছে। আর সেই সঙ্গে শরীরে মিশে রয়েছে ষড়রিপু। ফলে যশ খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এগুলো কিন্তু একপ্রকার নেশার মত। সুস্থভাবে বাঁচতে

গেলে, মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে, জীবনে চলার পথকে মসৃণ করতে গেলে এত কিছুর প্রয়োজন হয় না শুধু চাই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে শ্রদ্ধা করবে এটাই তো মানবজাতির কাজ। কিন্তু মানুষ তা না করে মানুষ সর্বনাশ করে। আমাদের সমবেতভাবে এগিয়ে এসে নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। কোন সরকারি চাইবে না নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক কেননা মদের লাইসেন্স সরকার দেয়। কারণ সরকার প্রচুর পরিমাণে কর আদায় করে। তাতে সরকারের সুবিধা। জনগণ যখন সেই মদ সেবন করে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে অর্থাৎ সরকারের অর্থ উপার্জন দুদিক থেকে তাই আগামী প্রজন্মের কাছে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে আজই আমাদের নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি পিতা-মাতাকে সচেতন হতে হবে, সংবাদপত্র দূরদর্শন পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে নেশা বিরোধী প্রচার করতে হবে। নেশাগ্রস্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মানব জাতিকে জীবনমুখী শিক্ষা ও বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের দীক্ষা দিতে হবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়-

“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।”

-0-

অজানা আনিনি

ড. মহানন্দা কাঞ্জিলাল
অধ্যক্ষা, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

সাজানো গোছানো সার্কিট হাউস আছে, সঙ্গে আছে গেস্ট হাউস। এই কথা শুনে আমরা উৎফুল্ল হলাম, কিন্তু তার পরে যেটা শুনলাম সেটা শুনে চমকে উঠলাম সবাই। শোনা গেল রাত্রে সুসজ্জিত ঘরে থাকা যায় বটে কিন্তু বন্ধ দরজার মধ্যে অনুভব করা যায় কার যেন চলাফেরা। সে কখন ফিসফাস করে নিশ্বাস নেয় বা জিনিষপত্র ফেলে বন্ধ ঘরে। জায়গাটির নাম হুনলি। অরুণাচল প্রদেশের দিবাং উপত্যকা জেলার অন্তর্গত। আমাদের গন্তব্য রোয়িং থেকে হুনলি, ইথোর, ইটালীন, এমিয়া পেরিয়ে নয় ঘণ্টা দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে আনিনি। তার আগে অরুণাচল প্রদেশের এই অঞ্চল সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আমাদের যাত্রা শুরু হয় আসামের ডিগবোই থেকে। অরুণাচল প্রদেশের এই দিবাং উপত্যকা ভারতবর্ষের তথা অরুণাচলের উত্তর পূর্বের শেষ রাজ্য। তাই ভারতের প্রথম সূর্যোদয় হয় এই জেলাতেই। পাহাড় দিয়ে তৈরি এই উপত্যকায় প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে সৌন্দর্যের ডালি।

ডিগবোই থেকে রোয়িং এর দূরত্ব তিন ঘণ্টা। রাস্তায় পড়ে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৯.২ কিমি লম্বা ঢোলা সাদিয়া সেতু এখন যা ভূপেন হাজারিকা সেতু নামে পরিচিত। এই সেতু নির্মাণের আগে অবধি এই দিবাং উপত্যকায় পৌঁছানো ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল ঢেউ সামলে নদীপথে পারাপার চলত সেই সময়ে। দিবাং উপত্যকার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খবর পৌঁছোতো না কারো কাছেই। রোয়িং এ আমাদের হোমস্টে- ছিল এক বিশাল দোতলা বাংলোর একতলা। এটি মোটামুটি একটা ফার্মহাউস বলা চলে। হাঁস মুরগী পালন ছাড়া বাগানে কলা, আনারস, টম্যাটো, লেবু সবকিছু গাছের সমাহার। বাড়ির কর্ত্রী সরকারি আধিকারিক বন দপ্তরের। উষ্ণ আতিথেয়তার সঙ্গে অনেক তথ্য পেলাম ওনার থেকে। উনি আদি সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে ছাব্বিশটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, যার অন্যতম আদি সম্প্রদায়। এই ছাব্বিশটির মধ্যে বারেটি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল আদি, আকা, আপাতানি, নিশি, তাগিন, গালো, খাম্পটি, মিশমী, মোম্বা, নাগা, শেরদুর্কপেন, সিংফো ইত্যাদি। এদের মধ্যে আপাতানি সবচেয়ে প্রাচীন। এই অরুণাচল প্রদেশেই রয়েছে ৫০টি আদিবাসী ভাষা ও তাঁদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লাইনটি না বললেই নয় -

"নানাভাষা নানামত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।"

এই ভাষাগুলি মূলত তিব্বত ও বর্মার, সাইনোতিব্বতী ভাষার শাখা ।

অরুণাচল প্রদেশের জনসংখ্যার ত্রিশ শতাংশ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ও উনত্রিশ শতাংশ হিন্দু। এছাড়া রয়েছে দোনি পোলো নামে একটি রাজ্যভিত্তিক ধর্ম যেটি তিব্বতী ও বর্মার আদিবাসী

ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এখানকার মানুষদের খ্রিষ্টীয় ধর্মান্তরকরণ থেকে আটকাতে ১৯৭০ সালে তালোম রুকবো নামে এক ব্যক্তি এটি তৈরি করে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি জীবনযাত্রা বজায় রাখতে সদা-সচেষ্ট। এখানকার প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে একটি ছাং ঘর। মেঝে তৈরি বাঁশ দিয়ে। মাঝে একটি স্থানে উপরে ঝুলন্ত একটা বাঁশের চৌকোনা তাক। নিচে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বাড়ীর লোকজন জড়ো হয় এখানে। খাওয়া দাওয়া, আলাপ চারিতার সঙ্গে প্রচণ্ড শীতে উত্তাপও মেলে এখানে। এই ঘরটি আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী বলে বিশাল অট্টালিকার বাড়িতেও ছাং ঘর থাকবেই। নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণের এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমাদের এই যাত্রাপথের শেষ ঠিকানা আনিনি। যেটি দিবাং উপত্যকার সদর কার্যালয়। পথে পড়বে আরেকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান মায়োডিয়া গিরিপথ। ৮৭১১ ফিট উচ্চতার এই গিরিপথ ভারত চীন সীমান্তের একটি উন্নতপূর্ণ গিরিপথ। পর্যটকদের কাছে এটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে কারণ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে এই দুর্গম গিরিপথ তুষারাবৃত থাকে। রোয়িং থেকে এই গিরিপথের দূরত্ব ছাপ্পান্ন কিলোমিটার হলেও পাহাড়ি রাস্তার বারোটি বাঁকের (যেটি বারো গোলাই নামে খ্যাত) যাত্রাপথ ও ঘনঘন বাঁক পরিবর্তন এটিকে দুর্গম করে তুলেছে। মায়োডিয়া গিরিপথের পাশে রয়েছে সেনা-ছাউনি আর বাহু দুর্মূল্য ওষধি গাছ-গাছড়ার বনাঞ্চল। দূর পাহাড়ের মাথায় বরফের মুকুটের শোভা জায়গাটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। 'মায়ু' শব্দের অর্থ পর্বত আর 'দিয়া'র অর্থ চূড়া। মায়োডিয়া তাই আক্ষরিক অর্থে পাহাড়ের চূড়া।

রোয়িং থেকে পাহাড়ি দুর্গম পথে আনিনি পৌঁছোতে লাগে নয় ঘণ্টা যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। মাঝে হুনলিতে গেস্ট হাউস আছে কিন্তু তার গল্প এই লেখার শুরুতে বলেছি তাই থাকার সাহস হয়নি।

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর দুর্গম পথ পেরিয়ে যখন পড়ন্ত বিকেলে আনিনি পৌঁছোলাম মনে হল জীবদ্দশায় স্বর্গে চলে এসেছি। দ্রি ও মাথুন দুটি নদীর মাঝে এই আনিনি উপত্যকা। আনিনি শব্দটি সম্ভবত এসেছে ইদুমিশসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের ইদু শব্দটি থেকে, যিনি এই সম্প্রদায়ের দেবী বলে পরিচিত। সংস্কৃতে এর অর্থ নারীর ক্ষমতায়ন। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই নামটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আনিনি তে বসবাস করে ইদুমিশমী সম্প্রদায়ের চার হাজার চারশো নব্বই জন মানুষ। এই সম্প্রদায়ের স্থান ভীষ্মক নগর রোয়িং থেকে ত্রিশ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানকার একটি দুর্গ বারো-শতকের যেটি ভাগবত গীতা ও মহাভারতে উল্লিখিত। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী ইদুমিশমী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। দুর্গম বলেই কমসংখ্যক মানুষের বাস এখানে, যার মধ্যে ষাট শতাংশ সাক্ষর। এখানে দুটি সরকারী স্কুল আছে। কিন্তু দুর্গম এলাকা ও যাতায়াতের দীর্ঘপথ বলে স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। গুটিকয়েক হোটেল ও হোমস্টে রয়েছে। আনিনিতে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও নির্জনতা উপভোগ করার শ্রেষ্ঠ স্থান। আনিনির মধ্যে দ্রষ্টব্য যে কটি স্থান তার মধ্যে পাহাড়ের শীর্ষস্থানে উঠে দেখা যায় গোটা উপত্যকা। ভারতের জাতীয় পতাকা

সেখানে সগর্বে প্রতিষ্ঠিত। আর একটি স্থান থেকে দেখা যায় দ্রি ও মাথুন নদীর সঙ্গম আর ওয়াচ-টাওয়ার থেকে দেখা যায় পর্বতবেষ্টিত পুরো উপত্যকা।

আনিনি থেকে ঘুরে আসা যায় আঠাশ কিলোমিটার দূরের চিগো রিসোর্ট। দ্রি নদীর পাশে এই রিসোর্টটির স্থান নির্বাচন প্রশংসা-যোগ্য। এই রিসোর্টটিতে শুধু নির্জনতার আস্বাদ পাওয়া যায় তাই নয় একই সঙ্গে পাহাড়, নদী ও ঝরনার মেলবন্ধনও প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁবুর আকারের কয়েকটি ঘরে আধুনিকভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে আর মাঝের রেস্তোরাটি সম্পূর্ণ বাঁশের তৈরি যেটি স্থানীয় মানুষরা চালায়।

আনিনি থেকে আরেকটি গন্তব্য হতে পারে মিপি উপত্যকা। এখানকার বিখ্যাত সাতটি হ্রদের যাত্রাপথ এখানেই শুরু হয়। অরুণাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য হল পাহাড়ের মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য হ্রদ। এই পথে প্রথম হ্রদটি বারো হাজার কুড়ি ফিট উচ্চতায়, দ্বিতীয়টি তেরো হাজার ফিট, তৃতীয় ও চতুর্থটি চোদ্দ হাজার ফিট, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমটি চৌদ্দ হাজার একশো-ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। হ্রদগুলির নাম হল, খাহুম, ইমুয়া, এমু, দিনি, চেনে আর হুহু। পর্বত প্রেমী আরোহীদের কাছে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই স্থান ভারতের একেবারে উত্তর পূর্বের রাজ্য এই অরুণাচলে শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমাহার নয় এখানকার বারোটি আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির সহাবস্থান (যা ভারতের মূল সংস্কৃতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন) অবাক করে তোলে আমাদের। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার এর উক্তিটি মনে পড়লো 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।' এক রাশ মুগ্ধতা ও বিস্ময় নিয়ে শেষ হলো আমাদের এই যাত্রা।

-0-

ক্লাস vii

মিতালী ঘোষ মৌলিক

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ ও অ্যাসোসিয়েট এন.সি.সি. অফিসার

এবার একটু ছোট বেলার কথায় আসা যাক্, সে এক অদ্ভুত সুন্দর ধারনা আমার শিশু মনে দৃঢ় বদ্ধ হয়, কারণটা হচ্ছে এ সময় আমি প্রথম প্রাইমারি স্কুলে class ONE-এ ভর্তি হয়েছি, সদ্য নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি সব কিছুই নতুনব্যাগ, বই, স্কুল ড্রেস, জলের বোতল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব পেয়ে পড়াশোনায় আগ্রহ আগের থেকে অনেকটাই বেড়ে গেলো, যদিও পড়ায় খুব ফাঁকিবাজ অমনোযোগী ছিলাম, সুযোগ পেলেই না পড়ার বাহানা খুঁজতাম। তো ঠিক সে সময় আমার বড়দি CLASS SEVEN এ পড়ে এই দেখে সেই সময় আমার মনের মধ্যে এক ধারনা তৈরি হ'ল CLASS "SEVEN" সব থেকে উঁচু CLASS, এই শ্রেণীতে পড়া খুব সম্মানের বিষয় এবং যাবতীয় শিক্ষাগত সমস্ত জ্ঞান এই ক্লাসে সময় অর্জন করা যায় ব্যাস্। তারপর পড়াশোনা শেষ ছুট্ টি। এই ধারণা বহুদিন অবধি ছিল। এই সব মিলেমিশে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল কবে আমি ক্লাস সেভেন এ পড়ব।

এরপর আমার এই প্রবল ইচ্ছাসহ ধারণাটি আমার মামাতো বোন (আমার থেকে কয়েক মাস ছোট হ'লেও আমরা একই ক্লাসে পড়তাম), এই একই ক্লাসে পড়াশোনার জন্য হয়ত, তাছাড়া মামার বাড়ি তো সবার প্রিয় জায়গা কথায় বলেনা "মামাবাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই "তো এই সব মিলে এই মামাতো বোনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তার কাছে আমার এই বিচিত্র ধারণার কথাটি বললাম, সেও আমার ধারণার সঙ্গে সহমত ঠিক আমার মতো তার মনেও তৈরি হ'ল আগ্রহ, অধীর অপেক্ষা ইস্! কবে ক্লাস সেভেনে পড়ব।

ছোটবেলায় বাবার চাকরী সূত্রে আমরা যে জায়গায় থাকতাম সেখান থেকে আমার মামারবাড়ি প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টার রাস্তা বছরে দু'বার আমরা মামাবাড়ি যেতাম, তখন আমাদের দু'জনের আলোচনার মূল আলোচ্য বিষয় কিন্তু এই "class Seven"। সময় ক্লাসগুলো তাড়াতাড়ি পেরচ্ছে না কেন! কবে এই ক্লাসে পড়ব!

ক্রমে এই প্রবল ইচ্ছা স্বপ্ন নিয়ে পাঁচ বছর পার হ'ল। এবার class V এ আমরা দুজনেই উঠলামহাতে হাতে দিন আর বছর গুনছি আর মাত্র দু' বছর পর আমাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত, অপেক্ষিত clas seven আসতে আর দেরী নাই। আচ্ছা এর মধ্যে এই ক' বছরে আমরা দু বোনে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই মাথায় লম্বা হয়ে গেছি, আমাদের এ উচ্চতার কাছে (ক্লাস ফাইভ এ পড়ার সময়) ক্লাস ফাইভ পড়াটা একটু খাটো শোনাতো। যেমন যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত কোন ক্লাসে পড়? উত্তরে বলতাম "CLASS V" প্রশ্ন কর্তার ভ্রু কুচকে নির্দ্বিধায় উত্তর হ'ত, "ওমা! এত নিচু ক্লাসে পড়িস্, আমিতো ভেবেছিলাম VII-VIII,"- তো এরকম কথা শোনার পর হতাশা ও লজ্জা বোধ ক'রতাম।

ইত্যবসরে এই বছর ঠিক গরমের ছুটির সময় আমার দেশের বাড়ি কান্দিতে (মুর্শিদাবাদ) বড়দা, জাঠতুতো দাদার বিয়ের দিন ঠিক হ'ল কচিকাঁচা থেকে বাড়ির বড়দের সবার খুব আনন্দ। তো সেই উপলক্ষে বাবা বিয়ের দশবারো দিন আগে থাকতে আমাদের দেশের বাড়িতে নিয়ে এলেন, কারণ বাবা-কাকাদেরই তো বিয়েবাড়ির সব কাজ দায়িত্ব সামলাতে হবে। যাইহোক আমাদের দেশের বাড়ি থেকে আবার আমার মামার বাড়ি খুব একটা দূরে নয়, সব মিলিয়ে মোটামুটি ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা হবে, তা আমরা দেশের বাড়ি পৌঁছানোর এক-দু'দিন পর বাবা মামাবাড়ি গিয়ে আমার দুই মামাতো বোনকে নিয়ে এলেন, এক সঙ্গে সবাই বিয়ে বাড়ির মজা হৈহুল্লোড় করব।

বিয়েবাড়ি মোটামুটি জমজমাট ইতিমধ্যে বিয়েবাড়ির অন্যান্য সব আত্মীয় স্বজন কাকা, জেঠু, কাকী, পিসি পিসে জেঠিমা, সব তুতো দাদা দিদি জামাইবাবু ভাই বোন সবাই চলে এসেছেন। এবার প্রশ্ন হ'তে পারে এত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের কী দরকার? আছে মশাই কারণ এই বিয়েবাড়ি সরগরমে আমরা দুই মামাতো পিসতুতো বোন মানে আমি আর আমার মামাতো বোন কাকলী দুই মক্কেলে এক মজার ঘটনা ঘটিয়েছিলাম। আচ্ছা। এই অবসরে জানিয়ে রাখি ইতিপূর্বে আমরা দুজনে সেভেন উচ্চারণটি কিভাবে করব মানে 'পাতি বাংলার' উচ্চারণ যেন না হয়, ইংলিশ শব্দ উচ্চারণ ঠিক তার মতো উচ্চারণ আয়ত্ত করে ফেলেছি।

অতঃপর বিয়েবাড়ি জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম তার সঙ্গে জলকষ্ট....। তুতো দাদাদিদি সবাই মিলে ঠিক ক'রল বিয়ের এই ক'টা দিন গ্রামের পুকুরে গিয়ে স্নান সেরে আসবে, কিন্তু বাড়ির সামনা সামনি যে ক'টি পুকুর আছে- তাতে কোনটাই জল কম, তো কোনটাই ঘোলা জল। যাইহোক শেষমেশ গ্রামের বসতি বাড়ি ছাড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের প্রান্তরে বিশালাকার এক দীঘিতে স্নান করব স্থির হ'ল। হাঁটাপথ তা প্রায় দশ বারো মিনিট হবে। অতঃপর সব দাদাদিদি ভাইবোনেরা একসঙ্গে দলবেঁধে প্রথম দিন স্নান করতে এলাম। সত্যিই খুব সুন্দর এক দীঘি জল টলমল করছে, কাঁচের মত স্বচ্ছ সুনির্মল জল সুদীর্ঘ তালগাছ নারিকেল গাছ পরিবেষ্টিত পরিষ্কার পরিছন্ন বেশ বড় বাঁধানো সিঁড়ি ঘাট, প্রবাহিত বাতাস দ্বারা জলের মৃদুমন্দ তরঙ্গে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের উৎকর্ষসাধক এই দীঘি সকলের মনকে ভুলিয়ে দিল। অভিভূত ও আনন্দে আহ্লাদিত হ'য়ে সকলে নিজের মতো লাফঝাঁপ সাঁতরাতে শুরু করে দিল। অবশ্য আগে থেকেই প্রত্যেকের নিজের নিজের বয়সের একেকটা গ্রুপ তৈরি হ'য়ে গেছিল। সবাই মোটামুটি সাঁতার জানে .....। আমি সাঁতার না জানার জন্য সিঁড়ি থেকে কিছুটা দূরে কোমর অবধি জলে কোন রকমে স্নান করছি। আরও বেশ কয়েকজন বিভিন্ন বয়সীর লোকজন এই পুকুর ঘাটে স্নান করছে। এর মধ্যে একটি মেয়ে বেশ হাসিহাসি মুখ ছোটখাটো গোলগাল চেহারার, আমাদের দুজনের থেকে ছোটই মনে হ'ল সে দেখছি খুব আগ্রহ সহকারে আমাদের সবার চান করার আনন্দ উপভোগ করছে। এবার সে কৌতূহল নিবারণ করতে না পেরে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে চলে এল এরপর আলাপ পরিচয় নামটাম সব জানা হ'ল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার মামাতো বোনটি তুলনামূলকভাবে আমার থেকে উপস্থিত বুদ্ধি বাকচাতুর্যে পারদর্শী, সুন্দর গুছিয়ে কথা ব'লতে পারে। তো এই সময় কিছু একটা অনুমান ক'রে কাকলী ঐ

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস ক'রে ফেলল "তুমি কোন ক্লাসে পড়?" এই প্রশ্নে মেয়েটি সহজ সরলভাবে উত্তর দিল, সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। এই কথাটা শোনার পর আমি আর কাকলী একটু হতবাক্, ভ্যাবাচ্যাকা ও মনে মনে অপ্রস্তুত হ'লাম, কারণ ধরেই নিয়েছিলাম মেয়েটি আমাদের থেকে নিচু ক্লাসেই পড়ে এতো উল্টো! এর ফাঁকে কাকলী আমাকে চোখের ইশারায় জানিয়ে দিল (আমরা কিন্তু class seven-এ পড়ি বলব) এত দিনের জমা প্রবল ইচ্ছা না হয় একটু মিথ্যে বলেই সে ইচ্ছা পূরণ করি। যেমন ইশারার নির্দেশ তেমনি কাজ। এবার মেয়েটিও স্বাভাবিকভাবে পাল্টা আমাদের জিজ্ঞেস ক'রল "তোমরা কোন ক্লাসে পড়?" প্রশ্নের উত্তরে মুহূর্তের বিলম্ব না ক'রে এক কথায় চট জলদি উত্তর অত্যন্ত stylish উচ্চারণে "সেভেন" এবং এক শূন্য মিথ্যে কথার গর্ববোধ ক'রলাম। যাইহোক মেয়েটি বোধহয় ধরেই নিয়েছিল আমরা দুজনে হয়ত ওরই মতো ক্লাস সিক্সে পড়ি। "সেভেন" কথাটি শোনার পর তার উত্তর হ'ল "ওমা! তোমরা তো আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ো।" একথা শুনে আমরা দুটিতে প্রমাদ গুনছি। তারপর একথা-সেকথার পর আমাদের সেদিনের স্নান পর্ব সেরে এবার বাড়ি ফিরব। এমন সময় মেয়েটি বলল আমিও এই কয়দিন তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে এই পুকুরে স্নান করব, ইত্যবসরে মেয়েটি কথার মাঝে বুঝে নিয়েছে বিয়েবাড়ির পার্টি আমরা। অতঃপর তার এই কথায় আমরা দুটিতে মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম এত বড় মিথ্যে কথা বলেছি, এবার যদি ধরা পড়ে যাই, খুব সাবধানে মেপে কথা বলতে হবে এবার।

এরপর বাড়ি ফিরে এসে আমি কাকলীকে বললাম মিথ্যে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কারণ এই ক'দিন আমরা ঐ পুকুরে স্নান করতে যাব, এতজন দাদাদিদি ভাইদের মধ্যে কারুর কাছ থেকে ও যদি জেনে যায় আমরা আসল কোন ক্লাসে পড়ি। তাহলে তো খুব লজ্জার বিষয় হবে। উত্তরে বোন বলল " ছাড়তো ! অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই, তাছাড়া মিথ্যে কথা ও নিজেও বলেছেওর চেহারা বলে দিচ্ছে ও আমাদের মতো class V-এ পড়ে, অতো ছোটখাটো মেয়ে কখনই ক্লাস সিক্সে পড়তে পারেনা। আর আমরা যদি ধরা পড়েও যাই তাতে কিছু যায় আসেনা ও যেমন মিথ্যে বলেছে তেমনি আমরাও বলেছি.. সমান-সমান।" তবে বোনটি আমার মুখে বড় বড় সাহসের কথা বললেও মনে মনে ভয় কিন্তু পেয়েছে সাথে TENSION। তারপরের দিন দীঘিতে স্নান করতে যাওয়ার আগে দুজনে ঠিক করে নিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে কম কথা বলব, আর ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে, যাতে আমাদের দাদাদিদি কারুর সাথে কথা বলতে না পারে কিছুটা চোরপুলিশ খেলার মতো। এরপর যে ক'টা দিন স্নান করতে যেতাম মেয়েটি ঠিক সেই সময় আমাদের সঙ্গে স্নান করতে চলে আসত, আর আমরা দুজনে পূর্বনির্ধারিত কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। তবে এখন ভাবি আর মনে মনে হাসি মেয়েটি সত্যিই খুব সহজ সরল ছিল, আমরা দুই বোনে একটা মিথ্যে কথা ঢাকার জন্য এত চালাকি করলাম, ও কিন্তু এই ক'দিনে বুঝতেও পারল না।

এবার দাদার বিয়ের দিন তো এগিয়ে আসছে, ঠিক বিয়ের আগের দিন যথারীতি স্নান করতে গেছি, মেয়েটিও এসেছে। আমরা চান করছি সে সময় আর একটি মেয়ে আমাদের থেকে একটু দূরে চান করছেতাকে দেখিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, জানতো ঐ যে মেয়েটাকে

দেখছো না! ও অনেক নিচু ক্লাসে পড়ে জানো! ...... আর ব্যাস্। যেই না বলা, কাকলী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে বলল "তোর তো দেখছি খুব বাজে স্বভাব, অন্যের নিন্দে করা, আর তুই বিশাল হাই পঞ্চাশ ক্লাসে পড়িস, বিরাট পণ্ডিত তুই।" এই ঝাঁজালো কথাগুলো শোনার পর মেয়েটি থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেল। আর আমরা দুই বোনে মেয়েটির ঐ কথাটা শুনে যথেষ্ট ভীত ও চিন্তায় পড়ে গেলাম "এইরে এবার আমরা ধরা পড়ে গেলাম বুঝি।" কাকলীর ঐ ধমকানি শুনে আমারও বেশ খারাপ লাগল, মেয়েটির ভীত সন্ত্রস্ত মুখ দেখে আমার মায়া হ'ল, মেয়েটির মনটাকে হালকা করার জন্য আমি ওর সঙ্গে দুচারটে কথা বললাম, বোন তো রাগে (ভয়ে) ওর সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে।

এবার বড়দার বিয়ের দিন, সেদিন আমরা আর ঐ দীঘিতে স্নান করতে যাইনি, সকাল সকাল স্নান করে নিয়েছি সামনের টিউবওয়েল থেকে। বিকেল নাগাদ সাজুগুজু ক'রে বরযাত্রী হ'য়ে বিয়ে বাড়ি তথা কনের বাড়ি যাওয়া অতঃ বিয়েবাড়ি হৈ চৈ মজা আনন্দ। তারপরের দিন দুপুরবেলায় নতুন বৌদিকে নিয়ে হৈহৈ করে আবার নিজেদের বাড়ি ফিরে আসা যাক্ একদিক দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হ'লাম আর ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নাই NO MORE TENSION, কারণ ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ হবে না।

যেখানে বাঘের ভয়
সেখানে সন্ধ্যে হয়।

এবার বিয়ের RECEPTION বৌভাত সমাগত, প্যান্ডেল রোশনাই ,সানাই এর সুমধুর সূর মূর্ছনা সেই সময় আমাদের দেশের বাড়ির ঐ দিকে চল ছিল, সানাই বাজনাদাররা বায়না দিলে বিয়ের বাড়িতে এসে বাজনা বাজাতো। সুন্দর পরিপাটি ক'রে সবার সাজগোছ হয়ে গেছে, সন্ধ্যে সাতটার পর নিমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। আমরা দুই বোনে খোশ মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এদিক থেকে ওদিক, হঠাৎ পিছন দিক থেকে কেউ একজন আমাদের নাম ধরে ডাকছে। পিছন দিকে তাকিয়ে আমাদের চক্ষু ছানাবড়া একি!! এতো সেই মেয়েটি, বোঝো ঠ্যালা, কথা বলব কি! আবার তো চোর-পুলিশ খেলার টেনশন!! কিছুটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম "তুমি এখানে? আগে বলোনি তো আমাদের এখানে তোমাদের নেমন্তন্ন আছে?" মেয়েটি হাসি মুখে উত্তর দিল- "আমিও কী থোড়াই জানতাম, আমি তো অন্য কোন বাড়ি মনে ক'রেছিলাম।" মেয়েটি আমাদের দুজনকে পেয়ে খুব খুশি, দুদিন আগের বকুনির কথা ও ভুলে গেছে। কিন্তু আমাদের দু বোনের মনে খুব একটা খুশি নাই। এইবার আমরা এক মুহূর্তের জন্য মেয়েটির সঙ্গ ছাড়া হচ্ছি না, পাছে সত্যিটা ও জেনে ফেলে। এমন কি বিয়েবাড়ি ভোজ খাওয়া দাওয়া পর্বটিও একসঙ্গে তিনজনে টেবিলে বসে খেলাম, ছোটখাটো কথাবার্তা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতা সঙ্গে। মেয়েটি তার বাবার সাথে এসেছিল, উনিও খেয়ে নিয়েছেন। এবার দুজনে বিদায় নিলেন।

আমরা দুটিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্ বাবা খুব বাঁচান বেঁচে গেছি। এ ভাবে গল্প হোক্ আমাদের ছোটবেলার রূপকথার।

-0-

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মৌসুমি পাল
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

একুটখানি হারিয়া যাওয়া
একটু খানি পাওয়া,
তাল মিলিয়ে যায় আসে
খুশির আবহাওয়া।
কিছু স্মৃতি ভুলে আবার
কিছু স্মৃতি করে রোপন,
তাল মিলিয়ে চলতে হবে
এরই নাম জীবন।

-0-

বিগত শতাব্দীর কন্যাদের প্রতি

রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

পৈশাচ বিবাহ!
সে তো ধর্ষণের আর এক নাম।
সেই তখন থেকেই ...
যেদিন অরণ্যের আদিম অন্ধকারে,
অথবা অল্প বন জ্যোৎস্নায়,
কাম-তাড়িত পুরুষের প্রবেশ পর্ণকুটিরে,
কোনো এক অক্ষত যোনি কুমারীর জন্য।
বা তারও আগে,
প্রমত্ত আদিম গুহামানব যে দিন
ধাবিত হয়েছিলো মানবীর দিকে,
পরাভূত করেছিলো তাকে,
সেদিন থেকেই...
এও এক সম্পদ, লুণ্ঠিত, গাভী বা অশ্বের মতোই।
তারপর পাল্টালো সময়, ধর্ষণেরও বদলালো রূপ।
চেহারাও।
বিবাহের যূপকাষ্ঠে বলি-প্রদত্ত হয়ে,
কখনো যুগল শয্যায়
একাকী নির্জনে, রণে, বিপন্ন সময়ের
বিপর্যয়ে, ক্রমশ সময়ে, অসময়ে,
তুমি সেই নারী, যাকে নগ্নিকা হতে হয়েছে
বারবার, প্রবল অনিচ্ছায়, আত্মসমর্পণে।
সুসজ্জিত হারেমে, সাহেবি ডাক বাংলোয়,
হোটেলের কামরায়, দ্রুত ধাবমান যানে, এমনকি স্বগৃহে,
তোমার প্রেমিক বা কোনো পরমাত্মীয় পুরুষের হাতেও...
তুমি লাঞ্ছিত রক্তাক্ত হয়েছো, একবার, দুবার, বহুবার...
ছেচল্লিশের দাঙ্গায়, একাত্তরের জঙ্গি হানায়,

প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবে, কয়েদখানায়,
দু হাজার বারোর নির্ভয়া কাণ্ডে, বা আঠারোর,
প্রবল শৈত্যে কাশ্মীরের, কোনো এক নিরালা উপত্যকায়।
আততায়ীর থাবা, দাঁত,... কিংবা নখাঘাত থেকে,
বাঁচতে চেয়েও .....
নাবালিকা বলে সেদিন, কেউ রেহাই দেয়নি তোমায়।
এই একবিংশ শতাব্দীতেও ... যখন সভ্যতার
ধ্বজা উড়িয়ে, আমরা এই আমরাই ... উল্লাসে মাতি,
গর্ভিণী হরিণীর নিধনে ... সেই এখন থেকেই
এখন.. এখন থেকেই...

-0-

পাখি

রিয়া দে

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

সন্ধীপুর নামক একটি গ্রামে এক বনিক ও তার স্ত্রী থাকতেন। তাদের সন্তান না থাকায় সেই দম্পতি ছিলেন অসুখী। একদিন এক মুনি ঋষির আশীর্বাদ স্বরূপ তাদের এক কন্যা সন্তান হলো। আদর করে সেই বনিক ও তার স্ত্রী কন্যাটির নাম রেখেছিলেন পাখি। সে যেন পাখির মতোই পুরো পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে পারে। পাখি ছিল সহজ, সরল এক সাধারণ মেয়ে। পাখি গ্রামের পণ্ডিতদের কাছে পড়াশোনা করত, এবং পণ্ডিতদের কাছেই পাখি বেশিরভাগ সময় কাটাতো, সেই সময় পণ্ডিতদের কাছে নানান রকমের আলোচনা ও চর্চা করতে করতে পাখি অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের জ্ঞানচর্চার বিষয়ে শুনে এবং তারপরেই তার মনেও ইচ্ছে জন্মায়, যে সে একজন মস্ত বড়ো অধ্যাপিকা হবে। কিছুদিন পরেই পাখির মা যক্ষ্মারোগে মারা যান।

পাখি বঞ্চিত হলো মাতৃস্নেহ থেকে। বনিক, তার স্ত্রীর বিরহে নিতান্ত ভেঙে পড়ে। তার ছোট্ট মেয়ে পাখির দায়িত্ব সামলাতে না পেরে, তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। পাখির দ্বিতীয় মা বেশ ভালোবেসেছিলেন পাখিকে। আর পাখি ও খুশি হয়েছিল তার দ্বিতীয় মাকে পেয়ে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হল কিছুদিন পর, সেই দ্বিতীয় মায়ের নিজের সন্তান হওয়ায়। সেই দ্বিতীয় স্নেহময়ী মা হয়ে উঠল সৎমা; সেই সৎমা পাখির পড়াশোনা বন্ধ করার জন্য ঘরের যাবতীয় কাজ পাখিকে দিয়ে করাতেন। কিন্তু তারপরেও পাখি পড়াশোনা বন্ধ করেনি। পাখির বাবা সমস্ত কিছু দেখেও প্রতিবাদ করতে পারতেন না, কারণ তার প্রতিবাদ দ্বিগুণ শাস্তি হয়ে নেমে আসবে পাখির ওপরে। অন্যদিকে সেই সৎমা চেষ্টা করতেন নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর, কিন্তু তার মেয়ে পায়েল ভালোবাসতো সাজগোজ করতে। তারপর এক বড়ো পরীক্ষায় পাখি খুব ভালো ফল পেয়ে পাশ করল। কিন্তু সেই সৎমায়ের মেয়ে পায়েল পরীক্ষায় ফেল করল। এরপর গ্রামের লোকের মুখে পাখির পড়াশোনার প্রশংসা শুনে তার সৎ মা ঈর্ষায়, ক্ষোভে পাখির ওপর অত্যাচার শুরু করে।

কিছুদিনের মধ্যে পাখির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সেই সৎমা পাখির বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর পাখি শ্বশুর-বাড়িকে মানিয়ে নিয়ে আবার পড়াশোনা করতে শুরু করে। পাখিকে আবার পড়াশোনা করতে দেখে তার সৎমা পাখির শ্বশুরবাড়িতে এসে গঞ্জনা দেন। আর তারপরই শুরু হয় শ্বশুর বাড়িতে পাখির ওপর নির্যাতন। তাকে শ্বশুরবাড়িতে অনেক কুকথা, অবজ্ঞা, অবহেলা, লাঞ্ছনা সহ্য করত, তা সত্ত্বেও যখন পাখির লেখাপড়া বন্ধ হলো না তা দেখে পাখির সৎমা পাখির শ্বশুর বাড়িতে পাখির নামে কুৎসা রটান, তার ফলে পাখিকে বেত্রাঘাত পর্যন্ত সহ্য করতে হয়। একদিন সবকিছু সহ্য করতে করতে পাখি ক্লান্ত, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরার আস্তে আস্তে পাখির লেখাপড়া গেল বন্ধ হয়ে। তারপরেও তার ওপর নির্যাতন বন্ধ হলো না, এরপর একদিন শেষ পর্যন্ত পাখির মৃত্যু ঘটল এবং পাখির অধ্যাপিকা হওয়ার ইচ্ছে ইচ্ছেয় রয়ে গেল। একটি পাখির মতো সেও মুক্তি পেল তার খাঁচার মতন জীবন থেকে।

প্রিয় ছাত্রীরা

শতাব্দী মুখার্জী
(শিক্ষিকা, ওয়েবেল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন)

সেশন শেষে নতুন সেশন
নতুন নতুন মুখ,
পুরোনোদের সব শেষ লেশন,
স্বপ্নে ভরা সুখ!

এক চিলতে রোদ্দুর গায়ে
মেখে আসে তারা,
যৌবনের প্রথম পর্ব বেয়ে
ভাসে মাতোয়ারা!

কচিপাতারা জড়ো হয়
এসে ক্লাসরুমে, মু
খগুলো প্রাণ করে জয়
প্রতি মরসুমে!

এইভাবে শুধুই চলতে থাকে
আসা-যাওয়ার পালা;
গুণের রেখায় স্মৃতি আঁকে,
লক্ষ ফুলের মালা।

হঠাৎ যদি হয় দেখা
পথের ধারেতেই,
বেরিয়ে পড়ে স্মৃতির রেখা
তাদের ছোঁয়াতেই।

ভালো থেকো ছাত্রীরা আমার
সর্ব কালেতেই,
উন্নতি আসুক হয়ে জোয়ার,
ওঠো শীর্ষ স্থানেতেই!

-0-

নেতাজী

শ্রেয়া লাহিড়ী

ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ

নেতাজী,তুমি তুমি বলেছিলে-
"তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"
আজ আমরা স্বাধীন নেতাজী,
তুমি যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলে তা হয়নি।
আমরা পরাধীন প্রযুক্তির কাছে,
আজ যুব সমাজ ব্যস্ত ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, চ্যাট করতে।
দেশের কথা তারা ভাবেনা, দেশ কেন মা বাবার কথাই ভাবে না।
আজ তোমার মত নেতাজী আমাদের খুব দরকার।
সমাজকে জাগ্রত করার জন্য।
তুমি কোথায় নেতাজী তুমি কোথায়?

-0-

গান্ধীজীর দুই ইংরেজ কন্যা

সুদীপ মণ্ডল

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

১

রিচার্ড অ্যাটেনবরোর অস্কারজয়ী সিনেমা 'গান্ধী' (১৯৮২) তে মিরা বেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী জেরাল্ডিন জেমস, অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা তাঁর। শান্ত - সৌম্য চেহারা, মৃদুভাষী গান্ধীজীর ছায়াসঙ্গীনি। সিনেমাটিই বোধহয় সারা পৃথিবীতে মিরাবেনকে পরিচিত করেছে। সিনেমায় কতটুকুইবা দেখানো হয়েছে মিরা বেনকে কতটুকুই বা জানা যায় তাঁর কাজ সম্পর্কে। তিন দশকেরও বেশি সময় ভারতবর্ষে থাকা মানুষটি ভালোবেসেছিলেন এই দেশকে, ভারতবর্ষের কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে ভাবিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারী শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার বিরোধিতা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষটি খুব বেশি গুরুত্ব পাননি। খুব বেশি চর্চাও হয়নি তাঁকে নিয়ে।

মিরা বেন এর আসল নাম মেডেলীন স্লেড। গান্ধীজীর আহ্বানে ইংল্যান্ডের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ছেড়ে ভারতে সন্তের মত জীবন কাটিয়েছিলেন। মিরা বেন এর জন্ম ১৮৯২ সালে ইংল্যান্ডের এক অভিজাত পরিবারে। তাঁর পিতা স্যার এডমন্ড স্লেড বৃটিশ রয়াল নেভির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। মেডেলীনের শৈশব কাটে মাতুলালয়ে, মাতামহ ছিলেন ইংল্যান্ডের গ্রামীণ এলাকার একটি বড় এস্টেট এর মালিক। তাই শৈশবেই সান্নিধ্য পেয়েছিলেন প্রকৃতির, পশুপাখিদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যেই সময় কাটাতে ভালোবাসতেন তিনি। আরেকটি প্রিয় শখ ছিল সঙ্গীত শ্রবণ। বিটোফেনের সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন ছোট্ট মেডেলীন। বিটোফেনের সংগীতের প্রতি এতটাই মুগ্ধতা ছিল যে ছোটবেলাতেই তিনি ঠিক করেন যেখানে বসে বিঠোফেন তাঁর অমর সৃষ্টি সিম্ফোনিগুলি রচনা করেছেন সেই স্থানগুলি পরিভ্রমণ করবেন। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলিকে অধিকার করে রেখেছিল বিটোফেন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক রোঁমা রোঁলার বিটোফেনের জীবনী পড়ে ফেলেন এক নিঃশ্বাসে। অদ্ভুত মুগ্ধতা ও ভালবাসা। সিদ্ধান্ত নেন রোঁমা রোঁলার সঙ্গে দেখা করবেন, দেখা হয় সুইৎজারল্যান্ডের ভিলেনিউব শহরে। এই সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সাক্ষাতের সময় কথাপ্রসঙ্গে রোঁমা রোঁলা তাঁর আরেকটি নতুন বইয়ের কথা উল্লেখ করেন- 'মহাত্মা গান্ধী'। নতুন বইটি পড়তে অনুরোধ করার পাশাপাশি লেখক বলেন, অদ্ভুত মানুষ এই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। একজন সন্ত। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ- যেন 'আরেকজন খ্রীষ্ট'। ইংল্যান্ডে ফিরে এসে অনেক প্রশ্ন নিয়ে পড়তে শুরু করেন মহাত্মার জীবনী। পড়তে গিয়ে আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এইরকম অদ্ভুত মানুষ মহাত্মা!। সত্যের জন্য যাঁর লড়াই। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ। বারবার পড়লেন সেই বই। সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন, আজীবন তাঁর সেবা করবেন। আর দেরী করা চলে না, তাই সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে বসলেন প্রিয় মানুষটির উদ্দেশ্যে। অতি শীঘ্র উত্তর এল, আহ্বান এল

কিন্তু সঙ্গে রইল সর্তকতা। একজন সাধ্বীর কঠিন জীবন সম্পর্কে, ত্যাগ ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে লিখলেন গান্ধীজী। জানতে চাইলেন আরাম আয়েশের জীবন ত্যাগ করে, কৃচ্ছসাধনের কঠিন জীবন যাপন করতে পারবেন কিনা। একটুও ভাবলেন না মেডেলিন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখতে বসলেন, জানালেন তিনি আসছেন ইপ্সিত ভূমি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে তিনি নিরামিষ খেতে শুরু করেছেন। মদ্যপান- যেটি ইউরোপীয় জীবনের অঙ্গ- ত্যাগ করেছেন। প্যারিসে কিছু সময় কাটালেন, সঙ্গে ছিল ঋগ্বেদ ও ভগবদ্গীতার ফরাসি অনুবাদ।

১৯২৫এর শীতের শুরুতে তিনি এসে পৌঁছলেন এলাহাবাদে। সাদর অভ্যর্থনা করলেন মহাদেব দেশাই, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং স্বামী আনন্দ। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি ভারতবর্ষের কাটালেন। হিন্দি শিখে নিলেন, কিছু সময় কাটালেন স্বামী পরমানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তি আশ্রমে। মেডেলীন ক্রমশ হয়ে উঠলেন মিরা বেন।

মিরা বেন যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্ত পর্ব চলছে। তিনিও রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন, ১৯৩১ -এ গান্ধীজির সঙ্গে গেলেন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কারাবরণও করতে হল। সরকারি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিলেন ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়নের খবর। ১৯৩৩ নাগাদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন দেখা হলো ফার্স্টলেডি মিসেস রুজভেল্টের সঙ্গে। স্বজাতির অন্যায়- অত্যাচারের কথা বললেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানের অর্ধাঙ্গিনীকে। ডান্ডি অভিযানের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী যখন গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে বেরিয়েছিলেন তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ স্বাধীন না হলে সেখানে আর ফিরে আসবেন না। সবরমতী তার ফেরা হয়নি গান্ধীজীর। জেল থেকে মুক্তির পর আশ্রয় নেন যমুনা লাল বাজাজের গৃহে। শুরু হয় সেবাগ্রাম আশ্রম তৈরীর কাজ। মিরা বেন ছায়াসঙ্গীর মত ছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে। এরপর ভারতের রাজনীতি আরো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ভারতছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ। গান্ধীজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনকে ভারত ছাড়া করবেন। গান্ধীজিকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল আগাখান প্যালেসে, সঙ্গে ছিলেন মিরা বেন। আগস্ট ১৯৪২ থেকে মে ১৯৪৪ পর্যন্ত বন্দী থাকতে হল সেখানে। আগাখান ফেলেছে বন্দি অবস্থায় মারা গেলেন গান্ধীজীর প্রিয় অনুচর ও ব্যক্তিগত সচিব মহাদেব দেশাই এবং কস্তুরবা গান্ধী।

৪২ এর আন্দোলনের পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকল। দেশ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেল। সিমলা কনফারেন্স, ক্যাবিনেট মিশন, গণপরিষদের নির্বাচন, ও ভারত বিভাজন যেন নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। ভাতৃহত্যা - রক্তপাত, অনেক বীভৎসতা দেখল ভারত। স্বাধীনতার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে গান্ধীজী যোগ দিলেন না। কলকাতার বেলেঘাটার বসে তিনি বললেন 'তাঁর বাণী ফুরিয়ে গেছে'।

আগা খান প্যালেস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর গান্ধীজীর অনুমতি নিয়ে মিরাবেন বর্তমান উত্তরাখণ্ডের রুড়কির কাছে মূলদাসপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন কিষান আশ্রম। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সময় কাটালেন। প্রকৃতির কাছে ফিরে গেলেন। শৈশবের প্রকৃতি প্রেম আবার নতুন করে

ফিরে এল। এরপরে ১৯৪৭ এ ঋষিকেশে স্থাপন করলেন পশুলোক আশ্রম, একটি স্বনির্ভর গ্রাম তৈরীর চেষ্টা করলেন নাম দিলেন 'বাপু গ্রাম'। ঋষিকেশ অবস্থানকালেই এল সেই ভীষণ সংবাদ ১৯৪৮ এর ৩০ শে জনুয়ারি। ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। প্রকৃতির কাছাকাছি এসে চলতে থাকল কৃষি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গান্ধীজী রাসায়নিক সারের বিরুদ্ধে জৈব সারের ব্যবহারের কথা বলতেন। মিরা বেন জৈব কৃষিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেন। কৃষিতে ট্রাক্টর এর ব্যবহারের ফলে লাঙ্গল এর ব্যবহারের কথা বলেন। সেচ ব্যবস্থায় বড় বাঁধের বদলে ছোট ছোট বাঁধের কথা বলেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার নেহেরুর চোখে তখন রাশিয়ার স্বপ্ন। ভারী শিল্প চাই, বড় বাঁধ চাই। উন্নয়নের ঢক্কা নিনাদে মিরা বেনের মত গান্ধীবাদীদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। সবুজ বিপ্লব এল সোনালী স্বপ্নের ডানা মেলে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হবে। বড় বড় রাসায়নিক সারের কারখানা গড়ে উঠলো, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। উচ্চ ফলনশীল বীজের আমদানি ঘটলো। তৃষ্ণার্ত উচ্চ ফলনশীল বীজের পিপাসা মেটাতে ভূগর্ভের জল গভীর নলকূপের মাধ্যমে নিংড়ে তুলে আনা হল। বড় বাঁধ তৈরি গৃহহারা হল অরণ্য বাসীরা। সবই দেখলেন মিরা বেন। হতাশ হয়ে বসে রইলেন না। চিরাচরিত কৃষিব্যবস্থার সমর্থনে প্রচার চালাতে লাগলেন। পরিবেশকে বাঁচানোর কথা বলতে থাকলেন। হিমালয়ের অরণ্য ধ্বংস হতে দেখে কলম ধরলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের বনদপ্তর তাঁর কোন উপদেশই মানলেন না। চিপকো আন্দোলন শুরু হলে ছুটে গেলেন অনুচর রাম স্বরূপকে সঙ্গে নিয়ে।

ভারতভূমি তাঁর কাছে ছিল তীর্থ স্বরূপ, মিরা বেনের আত্মজীবনীর নাম 'দ্য স্পিরিচুয়াল পিলগ্রিমেজ'। ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে মন টেকেনি, চলে যান অস্ট্রিয়াতে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে। জীবনের শেষ ২৩ টি বছর সেখানেই কাটান। মাঝখানে অবশ্য একবার আসতে হয়েছিল ইংল্যান্ডে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে। ১৯৬৯এ বাপুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, পিন্স অফ ওয়ালেস সহ অজস্র সম্মানীয় শ্রোতা, এলবার্ট হল তখন সাত হাজার বিশিষ্ট অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল। মিরা বেন বললেন ভারতবর্ষে কাটানো ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতার কথা, বাপুর কথা। স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ সকলে। ভিয়েনাতে ফিরে এসে, কৈশোর প্রথম যৌবনের সঙ্গীত নতুন ভাবে ধরা দিল, চলতে থাকল সুরের সাধনা। ১৯৮১ তে ভারত সরকার তাঁকে দ্বিতীয় নাগরিক সর্বোচ্চ সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' প্রদান করে। সরকারি সম্মান প্রদানই কী সব? কতটুকু মনে রাখতে পেরেছি আমরা তাঁকে? তিনি তো প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন। প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে সম্পদ আহরণের বিরোধিতা করেছিলেন। রাসায়নিক নির্ভর কৃষি ও বড় বাঁধের বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের কথা তো শোনা হয়নি। আজ যখন ধণতন্ত্রের বিপদ আসন্ন, তখন আবার নতুন করে তাদের কথা ভাবতে ইচ্ছে হয়।

২

ক্যাথেরিন মেরি হেইলম্যানের জন্ম ১৯০১ সালে পশ্চিম লন্ডনের শেফার্ডস বুশ অঞ্চলে। সূর্য অস্ত না যাওয়া এক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে। গর্বিত এক জাতির সদস্য তিনি- সারা পৃথিবীতে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যাদের কাঁধে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশ গুলির স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্র থেকে তাদের জনগণকে উদ্ধার করতে হবে, পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের মতো আধুনিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। দিতে হবে আইনের শাসন। ছোটবেলা থেকেই এসব জানতেন ক্যাথরিন। সাম্রাজ্যের কোথাও কোথাও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা শোনা যেত। কৈশোর বয়সে শুনলেন এক ব্যারিস্টার এর গল্প, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নেতা তিনি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। পুলিশের উদ্যত লাঠির সামনে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আছে আবার অহিংসার পূজারী তিনি। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়। মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এক মুহূর্তও দেরি হয়নি সিদ্ধান্ত নিতে। ১৯৩২ সালে ঘর ছাড়েন ভারতের উদ্দেশ্যে, কোনদিন আর ফেরা হয়নি। ভারতকে ভালোবেসে ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি, কর্মভূমি ভারতবর্ষ।

ভারতে প্রথমে কিছুদিন উদয়পুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর গান্ধীজীর সেবাগ্রামে আট বছর কাটান। স্বয়ংসম্পূর্ণ আশ্রমিক জীবন। অন্য এক জীবন-দর্শন, পশ্চিমের সঙ্গে মেলানো যায় না কিছুতেই!। ত্যাগে যে এত শান্তি আছে, ইংল্যান্ডে থাকাকালীন কি বুঝতে পেরেছিলেন? প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবেসে ছিলেন। প্রকৃতি যে মা! তাকে জেতা যায় না। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে সেবা গ্রামে থাকাকালীন গভীরভাবে প্রভাবিত হন গান্ধীজীর 'নঈ তালিম' ধারণার দ্বারা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা - জীবনের স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে মানুষ হওয়ার শিক্ষা। ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করতে থাকেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর বাইরে এসে নতুন শিক্ষার ধারণায় আস্থা রাখার জন্য।

এরপর চলে আসেন ইউনাইটেড প্রভিন্সের আলমোড়া জেলায় এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করতে থাকেন। পুরুষের মদ্যপান পাহাড়ি মহিলাদের জীবনে যে দুর্বিষহ অভিশাপ নামিয়ে এনে ছিল তার নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন। ভাটিখানায় গিয়ে দড়িতে বাঁধা দিতে থাকলেন গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে, এই কাজে অনেকাংশ সফলও হয়েছিলেন।

সরলা বেন নিজেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা বলে মনে করতেন। বিয়াল্লিশের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় কুমায়ুন জেলায় জনগণকে সংগঠিত করতে কাজ করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের কারাবরণ করতে হয়েছিল। প্রায় দু বছর তিনি জেলে ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্মী আশ্রম ১৯৪৬এ। এই আশ্রম তৈরি করেছিল বিমালা বহুগুণা রাধা ভাট ও বাসন্তী দেবীর মত স্বাধীনতা সংগ্রামী দের।

বন্যপ্রাণ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তার অবদান অবিস্মরণীয়। চিপকো আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। ভারত-চীন যুদ্ধের পরবর্তীকালে সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলোতে সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ শুরু করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে হিমালয়ের বনভূমি অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। হাজার হাজার বছর ধরে অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল গ্রামীন মানুষেরা তাঁদের জীবন-জীবিকা রক্ষার তাগিদেই বনভূমি রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়। বিনোবা ভাবে সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, বিহারে ভূদান আন্দোলনে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মিরা বেন সঙ্গে নিয়ে তিনি হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন।

1961 সালে সরলা বহনের অভিভাবকত্বের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরাখণ্ড সর্বোদয় মন্ডল। হিমালয় অঞ্চলের মহিলারা মদ্যপান এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া এই সংগঠন কাজ করেছিল বনজ সম্পদ নির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এই সংগঠনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখিকা ছিলেন হিন্দি ভাষায় বাইশটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী *Life in Two Worlds: Autobiography of Mahatma Gandhi's English Disciple* একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেম কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ভারতের প্রতি ভালোবাসা, একটা অব্যক্ত আক্ষেপ- কেন ভারতবর্ষে জন্ম নেননি?

১৯৭৫এ সরল বেন উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার ধরমগর গ্রামে কুটির জীবন শুরু করেন। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন।১৯৮২ তে মৃত্যুর পর হিন্দু রীতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় প্রবল আস্থা জন্মেছিল জীবনের উপান্তে। প্রকৃত কর্মযোগীর মত সারাজীবন শুধু কাজ করে গেছেন ফলের আশা করেননি। হিমালয় কে বাঁচাতে হিমালয়ের পরিবেশকে বাঁচাতে তার অবদান অবিস্মরণীয়। অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে চিপকো আন্দোলনের তুমি এক অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর সারাজীবনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে, 'হিমালয়ের কন্যা' 'উত্তরাখণ্ডে সামাজিক আন্দোলনের জননী' বলেও অভিহিত করা হয়। আজ তাঁর মৃত্যুর পর ৪০বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানই নয়, তাঁর জীবন দর্শনকে অনুসরণ করতে পারলে, সেটাই হবে তাঁরপর প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

-0-

পক্ষীসভা

সুপর্ণা চক্রবর্ত্তী

ছাত্রী, রসায়ন বিভাগ

পক্ষীসভায় আজকে হবে
বিরাট আলোচনা-
সব পাখিরা হাজির হল,
সঙ্গে ছানাপোনা।
সবার মতে বাজ দাদা আজ
হলেন সভাপতি,
শুরু হলো আজকের সভা
বিষয়, মানুষের মতিগতি।
চিল ভায়া বললে রেগে,
"বুঝি না বাপু আমি,
মানুষের কাছে শুধু নিজের
সুখটাই কী দামী?
আমাদের বাড়ি, আমাদের ঘর
করছে কেটে সাফ-
এত এত গাছ কাটছে
তবু নেইকো অনুতাপ!"
কোকিল বলে, "বসন্ত এলে
আর খোঁজে না কেউ আমায়।
আমার গান আজ হারিয়ে গেছে
মাইকের রমরমায়।"
বললে বাবুই, "পুকুর পাড়ের
তালগাছেতে মোর বাসা।
সেটাও ভেঙে ফেলল ওরা
এমন সর্বনাশা!
বলছে ওরা, বুজিয়ে পুকুর

করবে কী সব বাড়ি-
আমরা তবে কোথায় যাবো,
নিজের বাসা ছাড়ি?
বিরাট গাছের চেয়েও উঁচু
আজব লোহার খাঁচা-
ছুঁলেই ভীষণ আঘাত লাগে,
শক্ত মোদের বাঁচা,"
"এইতো সেদিন, শালিক ভায়া
যেই বসেছে তারে,
অমনি ছিটকে পড়ল গিয়ে
ছোটো নদীর পাড়ে।"
দেখে শুনে সবকিছু
বললেন সভাপতি,
"সমস্যা বেশ গম্ভীর
হচ্ছে মোদের ক্ষতি।
এক্ষুণি এই বিপদকে যদি
ঠেকাতে না পারি,
আসবে তবে ঘোর বিপদ
লাগবে মহামারি।
আজ থেকে তাই সবাই মোরা
করব ধর্মঘট,
সব পাখিরা করবে এবার
মানুষকে বয়কট।
মানুষ যতই হোক না কেন
সর্বশ্রেষ্ঠ জীব,
পাখি বিনা এই পৃথিবী
নিষ্প্রাণ, নির্জীব।"

-0-

नारी की पहचान

करीना कुमारी विश्वकर्मा

विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

मैं नारी हूं
मेरी पहचान नारी
मैं सीता की शक्ति
मैं मंदोदरी का धैर्य हूं।
मैं राधा का प्रेम
मैं चंडिका का क्रोध हूं।
मैं गंगा की शीतलता
मैं आग की ज्वाला हूं।
मैं पठानी रजिया
मैं मेवाड़ की शान हूं।
मैं सत्यवती सावित्री
मैं अनसूया की आन हूं।
मैं ममतामयी नारी हूं।
पर संग में तीक्ष्ण कटार हूं।
मैं रिश्तों की शान हूं
मैं रिश्तों में लिपटी आन हूं।
मैं जीवन की शुरुआत हूं।
हां मैं एक नारी हूं।
सदियों से जंजीरों में जकड़ी गुलाम
दुष्ट का संहार करने वाली दुर्गा हूं।
सब सुखों को त्याग करने वाली सीता
या राक्षसों का वध करने वाली काली हूं।
हां मैं एक नारी हुं।
भरी सभा में बेइज्जत होने वाली द्रौपदी

या तलवार लेकर लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई हूं।
विद्या से सदैव दूर रहने वाली
या सबको विद्या देने वाली सरस्वती
घरों में रहने वाली रजिया हूं।
हां, मैं एक नारी हुं।
इतिहास रचने वाली हूं।
पढ़ जिसे गर्व महसूस करें
वह इतिहास बनाने वाली हूं।
हां मैं एक नारी हुं।
आज के खुली आसमान में उड़ना चाहती हूं।
मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं।
हां मैं एक नारी हूं।

-0-

जीवन स्त्री का

निधि कुमारी

विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

जन्म लेते ही जो बोझ हुई वह "जीवन स्त्री का"।

हर आवाज पर जो चुप कराई गई वह "जीवन स्त्री का"।

ग्रहणी बताकर उठते सफलता की उन कदमों को दबा दिया जाने वाला वह "जीवन स्त्री का"।

हर कार्य को करने के सर्वप्रथम असंख्य बार विचार पर मजबूर करने वाला वह "जीवन स्त्री का"।

परंतु !

नई उषा के साथ नई युग की नारी ने थाम लिए जब "तलवार कलाम के" बदल गया ना रहा पूर्व सा "जीवन स्त्री का"।

अब ना रही बेटियां उस हद तक बोझ अधिकांश घरों में हां यही "वास्तविक जीवन स्त्री का"।

हर आवाज पर चुप न रहकर शेरनी सी दहाड़ने वाली आज की बेटियां हां यही "वास्तविक जीवन स्त्री का"।

आज एक कुशल गृहणी रहकर भी हर कार्य को करने की शक्ति रखने वाली वह "आदिशक्ति" आज की बेटियां हां यही "वास्तविक जीवन स्त्री का"।

हरे भरे वृक्षों सा , रंग-बिरंगे फूलों की खुशबुओं सा ,लहलहाती बाजरे की कलगी सा हां यही "वास्तविक जीवन स्त्री का",हां यही तो "वास्तिक सफ़लता स्त्री की"।

-0-

समाज में कोई ऐसा धर्म चलाया जाए

पिनाकी सिंह

लेक्चरर, हिन्दी विभाग

सोचती हूं, समाज में कोई ऐसा धर्म चलाया जाए।
जिसमें इंसान को इंसानियत सिखाई जाए।
न बाँटा जाए उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में,
ना फूट फैलाई जाए समाज के भाई-भाई में।
नदियाँ पानी बहने के लिए हैं।
खून की नदी न बहाई जाए।
अगर भूखा रहे पड़ोसी मेरा।
तो रोटी मुझे भी ना खाई जाए।
हर बगीचे में फूल इस शिद्दत से खिलाए जाएं।
महक उठे हर आंगन कहीं भी जात आड़े न आए।
हों भले तन से जुदा हो हम सब
पर तुम्हारे आँसू मेरी पलकों से उठाया जाएँ।
चलो ना कोई ऐसा धर्म चलाया जाए।
जहां इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए।

-0-

बस नारी होना

ममता कुमारी

विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

"जहां पूजी जाती है नारी,वहीं उनका अपमान क्यों है?
भ्रूण हत्या,बलात्कार,घरेलू हिंसा,शोषण की शिकार क्यों है?
नारी को कहते है शक्ति, करते भी है हम उसकी भक्ति
दुर्गा,काली,सीता और ना जाने कितने अवतारों में
फिर भी समाज में मिलता नहीं उसको स्थान है।
आधी आबादी हैं ये इनका उचित सम्मान करो
नारी को नारी समझो, मत उनका अपमान करो।
समाज से पूछना है हमें, ये सब क्या है ?
समता के अधिकार न रखना, क्षमता की हत्या है।
बहलाया - फुसलाया सबने, कन्या को अंधी कर
चंडी कहकर पूजा की, और बिठा दिया मंडी पर
मंडी, जिसमें कीमत तय करता है केवल नर ही
नर को चाबुक मिला हाथ में नारी को बस डर ही
नारी करती रही काम, चोटें चाबुक की सहकर...
इस पर भी नर हुआ नहीं, नारी का आभारी
पितृसत्ता के झोल में, नारी रह गई मात्र बेचारी
नर दाता बन कर के बैठा.. औरत बन गई दासी
समता के सपनों को सदा से, लगती आई फांसी।
और इस फांसी का कारण क्या है?
बस नारी होना !
क्या यह कारण कर देता है हमको इतना बौना?
ज्यादा हो अधिकार नरों को, इतना अद्भुत क्या है?
दो दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है?

मत छेड़ो मैं नारी हूं

रितु कुमारी साव
विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

मत छेड़ो मैं नारी हूं,
कुछ भी कर के दिखला जाऊंगी।
ना कोसों मुझ तानों से,
मैं भी एक इंसान हूँ।
सहने की ताकत नहीं मुझमें ,
मैं नहीं भगवान हूँ ।
जिस तरह दी आजादी,
मर्दों को समाज में,
मैं भी कुछ कर दिखलाऊंगी,
कह रही ललकार मैं ।
मैं एक नारी हूँ,
सीता बन कर सह जाऊंगी,
काली बन दिखला जाऊंगी ।
मैं ज्वाला की अंगार हूँ,
मैं ही शीतलता की राहत,
हौसलों की चाहत हैं बुलंद मुझमें,
बाज की ऊँचाईयों सी उड़ान हैं।
मत छेड़ो मैं नारी हूँ,
कुछ भी कर के दिखला जाऊंगी ।

-0-

गुरु का योगदान

रूपा वर्मा
पूर्व छात्रा और WEBEL संकाय

जब शिशु के रूप में जन्म हुआ,
तब 'माँ' रूपी पहला गुरु मिला।
बोलना सीखना शुरू किया,
तब पहला शब्द माँ निकला।
उंगली पकड़कर अपने पैरों पर खड़ी हुई,
तब 'पिता' रूपी गुरु मिला।
अपने कंधों पर बिठाकर,
इस दुनिया को अपनी नजरों से दिखलाया।
घर से निकल पहली बार,
शिक्षा पाने का रास्ता दिखाया।
और इस प्रकार, स्कूल का पहला दिन शुरू हुआ,
और ढेर सारे गुरु मिले,
मन में ज्ञान का दीप जलाकर,
सुनहरे भविष्य का सपना संजोया।
जिंदगी का सफर शुरू हुआ,
भविष्य की तैयारी शुरू हुई।
अक्षर के ज्ञान से शुरू करके,
सूरज की तरह, रोशनी बिखेरना
गुरु ने सिखाया।
कमजोर परिस्थितियों में भी ताकतवर,
गुरु ने बनाया।
नदी की तरह बिना रुके बहते हुए,
चांद की तरह शीतल होते हुए,
जिंदगी में सब कुछ बिना जीते,
कभी-कभी हार कर भी बहुत कुछ पाना,
गुरु ने सिखाया।
कलम तो पकड़ा था मैंने, पर सही तरीके से चलाना,
गुरु ने सिखाया।

आत्मविश्वास की कमी पर, आत्मविश्वास जगाया।
उसूलों की नींव पर चलकर,
जिंदगी में आगे बढ़ना गुरु ने सिखाया।
भूल होने पर, भूल को दृढ़ता से मानकर
उसे सुधारना, गुरु ने सिखाया।
और हमसे हमारी पहचान करा कर,
जीवन में एक सच्चा इंसान बनना, गुरु ने सिखाया।
गुरु शिष्य की परंपरा का,
इतिहास से उदय हुआ।
महाभारत जैसे युद्ध में, श्री कृष्ण जैसे गुरु मिले।
जब देश में अखंड भारत का निर्माण हुआ,
तब चाणक्य जैसे गुरु मिले।
जब देश ने नारी का सम्मान किया,
तब श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले।
और इस प्रकार, गुरुओं ने
देश का उद्धार किया।

-0-

HUMANITY

Riya Rudra
Student, History Department

Humanity is an integral part of life which tells that to help other living beings, try to understand others cand realize their problem with their perspective and try to help them. For expressing humanity you don't need to be a well-off person; everyone can show humanity by! Them, part of our nation. Every religion in helping someone or sharing with this world tells us. About humanity peace and love.

The thoughts of such humanities have reached the hearts of many people across this planet. To name a few people are Mother Teresa, Mahatma Gandhi, and Nelson Mandela. By taking Mother Tere- sa as an example of a humanitarian we see that she had dedicated her entire life serving the poor and the needy from a nation who she barely had any relation. The great Indian poet, Rabindranath Tagore, expressed his strong beliefs on humanity and religion in his noble prize - cwiming piece, Gitanjali, Humanity is a value. that binds us together.

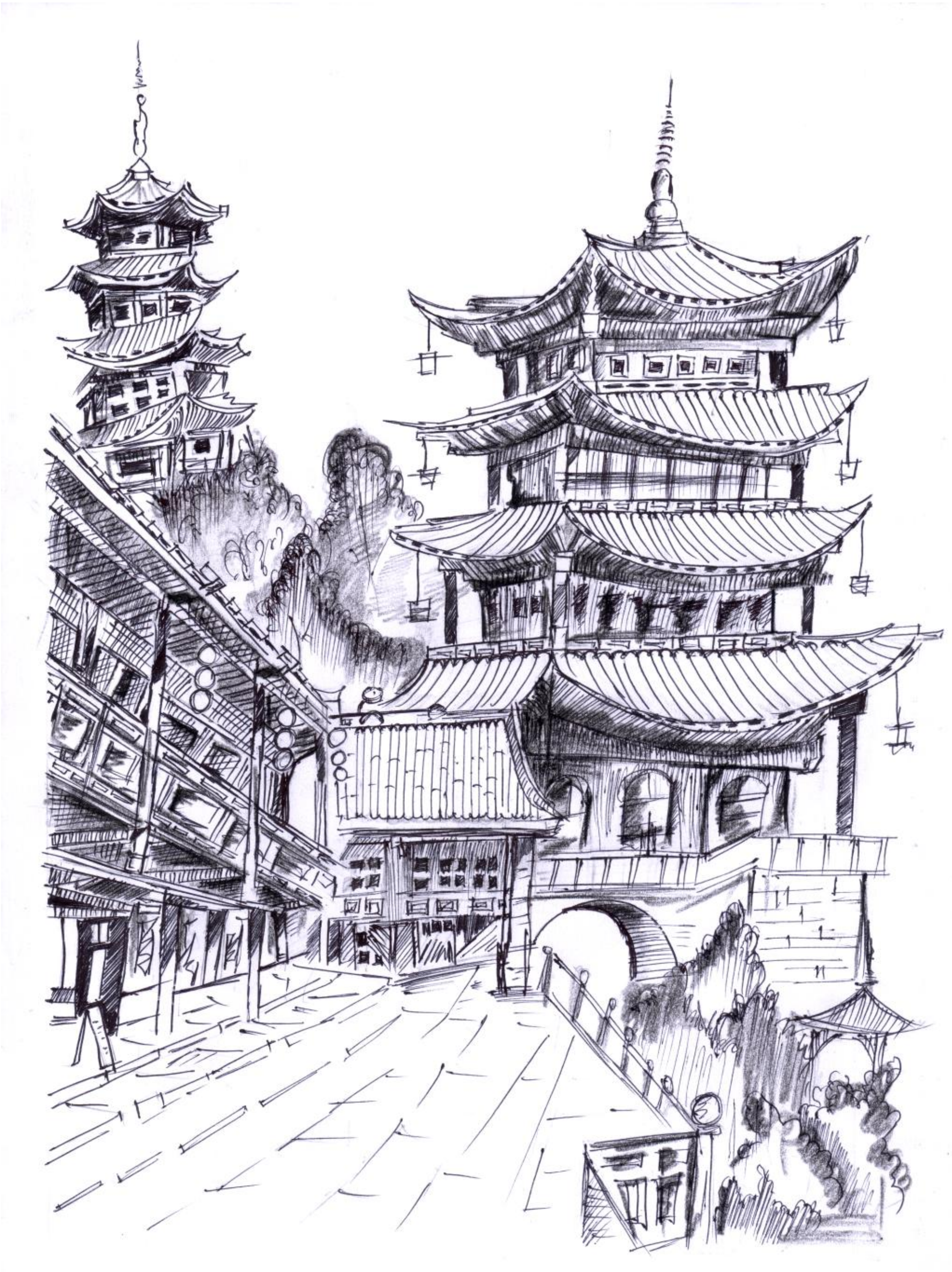

জাপানি মন্দির

সুলেখা মুর্মু
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

ফ্লোরেন্স নাইটঙ্গেল

পৌলোমী দাস
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

গৌতম বুদ্ধ

প্রিয়া বাগ্‌দী
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

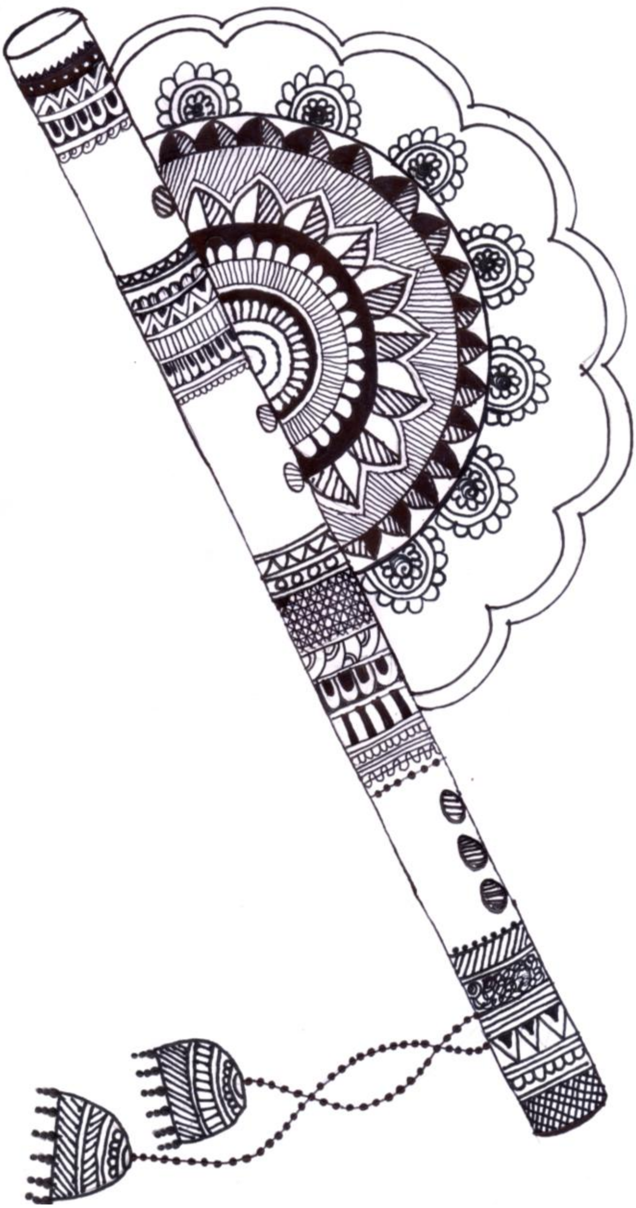

মন্ডলা শিল্প

রিয়া রুদ্র
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

অপেক্ষারত

প্রতিমা চ্যাটার্জী
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

"বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।"

\- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর